হিটলারের পতন

প্রভাস দাশ

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম ঃ পাঁচ সিকা

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ৬নং জয়নারায়ণ চন্দ্র লেন হইতে প্রকাশিত ও
বি, এন, ঘোষ কর্ত্তৃক ১।১।১, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীটস্থ
আইডিয়াল প্রেস হইতে মুদ্রিত।

বাবা ও মাকে——

মিস্ তমসা আমার সম্পূর্ণ কাল্পনিক নায়িকা। কোন বিশেষ নারীকে কেন্দ্র করে এঁর চিত্র গড়ে ওঠেনি।

এই পুস্তকের সব গল্পগুলিই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখন সেগুলিকে একত্রে সন্নিবেশিত করা হ'ল। কেবল প্রয়োজন বোধে দু' একটি গল্পের নাম বদলান হয়েছে।

নানান প্রকারের রুচি সম্মত পাঠক পাঠিকাদের জন্যে নানান রকমের বিষয়বস্তু সম্বলিত ছোট বড় গল্প এতে স্থান পেয়েছে এবং এগুলি দিয়ে পাঠক পাঠিকাদের প্রচুর আনন্দ দিতে পারব এই আশাতেই এই পুস্তকাকারে গল্প পড়ার বিদ্বেষের দিনেও আমার এ কষ্টসাধ্য আয়োজন করতে সাহস পেয়েচি। এখন যাঁদের জন্যে আমার এ আন্তরিক আয়োজন তাঁদের খুশী করতে পারলেই নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব।

পরিশেষে আমার এ আয়োজনের প্রধান উদ্যোক্তার নাম না করে থাকতে পারছি না। তিনি হ'চ্ছেন—শ্রীযুত যামিনী কুমার দাস।

ক'লকাতা
১০ই পৌষ ১৩৪৭

ইতি—

লেখক

এই লেখকের উপন্যাস

নারী ও নিয়তি

(যন্ত্রস্থ)

দিব্যেন্দুর মসৃণ চলার পথে হঠাৎই একদিন সন্ধ্যা তার বিধবার শুভ্র বেশ নিয়ে এসে হাজির হ'ল। ভ্রাতা ভগ্নির সম্বন্ধ স্থাপন করলে তারা। নারীর স্পর্শে—সন্ধ্যার স্পর্শে—দিব্যেন্দুর জীবনে একটা আমূল পরিবর্ত্তন এসে গেল। পৃথিবীর সব কিছু ভুলে একমাত্র সন্ধ্যাকেই কেন্দ্র করে তার জীবন মধুময় হয়ে উঠল। কিন্তু তার পরিণামে কি হ'ল? সময় সময় দু'টি অজানা, অচেনা, অনাত্মীয় নর নারী এই যে ভ্রাতা-ভগ্নির সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাদের পক্ষে চিরকাল কি ঠিকমত এই বিশাল গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব? কোনদিন কোন অসতর্কিত মুহূর্ত্তে তাদের এই বিশাল গণ্ডী কি মুছে যাবে না? যে যুবতী একবার কোন যুবককে ভালবাসে তার স্মৃতি সেকি ভোলবার শত আয়োজন করেও, দেবতার কাছে প্রার্থনা করেও, কোনদিন নিজের মন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারে? কোনদিন কি তার দু'গাল বেয়ে দু' ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে না? আরতি কি দিব্যেন্দুকে চিরকালের জন্যে ভুলতে পেরেছিল?—লেখক জীবনের এই সমস্ত জটিল প্রশ্নের অতি সুন্দর হৃদয়গ্রাহি ভাষায় এবং অদ্ভুত ভঙ্গিতে মীমাংসা করেছেন এই আধুনিকতম উপন্যাসের পাতার মধ্য দিয়ে।

এই তো জীবন

চার বছরের মেয়ে বেলারাণী মুখ ভার করিয়া বাঁকিয়া বসিয়াছে—মাছের মুড়া না দিলে আজ আর সে ভাত খাইবে না। মা জপমালা বুঝাইয়া বলে, আজ খা মা, আজ কোত্থেকে পাব মাছের মুড়ো, কাল বাজার থেকে আনিয়ে ভাল করে রেঁধে দোব

বেলারাণী কিন্তু সে কথা মানিতে চায় না। সে সকালে তাহার বাবাকে বাজার হইতে মাছের মাথা আনিতে দেখিয়াছে।

মাতা জপমালা কন্যাকে এইবার উপদেশ দেয়—আজ উনি খাবেন, ওকি খেতে চাইতে আছে? কাল তোমায় দোব।

বেলারাণী ছোট মেয়ে। উপদেশ সে বুঝে না। সে অনুনাসিক সুরে বায়না ধরে, না আমি খাঁব।

মেয়ের কাণ্ডজ্ঞানে জপমালার মনে আগুন জ্বলিয়া উঠে। সে বলে, কি অসভ্য মেয়ে বাবা!

বেলারাণী কিছুই মানে না, সে হাত গুটাইয়া নাকি সুরে কাঁদিতে থাকে। এইবার জপমালা আর কোন কথা না বলিয়া রাগে গস্ গস্

করিতে করিতে মাছের মুড়া আনিয়া ধপাস্ করিয়া মেয়ের পাতে ফেলিয়া দিয়া চেঁচাইয়া উঠে, হ্যাঁ, মা খাও, যদি খেতে না পার ত' আজ তোমায় জন্মের মত খাইয়ে দোব। নিলে বটে, শেষে যদি বল, ঝাল কি কিছু, তা হ'লে মা দেখবে, হ্যাঁ, এই বলে রাখলুম, নাও খাও।

ভয়ে ভয়ে বেলারাণী মাছের মুড়া একটু একটু করিয়া ভাঙ্গিয়া খাইতে থাকে; পাতে মাছের মুড়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সখ মিটিয়া গিয়াছে। তাহার আর খাইতে ইচ্ছা করে না, তায় আবার ঝাল! সে হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। মাতা জপমালা হাত দুইটি পিছনে করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মেয়ের খাওয়া দেখিতেছিল। ইচ্ছা ছিল না খাইতে পারিলে নিজের মনের ঝাল মিটাইয়া লইবে। মেয়েকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, কিরে, বসে রইলি যে বড়? খাচ্ছিস্ না?

বেলারাণী আবার হাঁটুর মধ্যে মুখ গুজিয়া নাকি সুরে বলে, না বড় ঝাল, আর খাঁব না।

—তা খাবে কেন? তখনই ত' বলেছিলুম। নেবার সময় ত খুব! দাঁড়াও, তোমার খাওয়া একেবারে ঘুচিয়ে দিচ্ছি!—বলিয়া বেলারাণীকে বেশ করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য জপমালা শূন্যে হাত তুলে; কিন্তু দুর্ভাগ্য এমন যে কোন দেবতার শাপে যেন শূন্যে তোলা হাত শূন্যেই রহিয়া যায়। ইতিমধ্যে বছর দেড়েকের ছেলে খোকা কোথা হইতে হামাগুড়ি দিয়া আসিয়া পিছন হইতে ঝপাৎ করিয়া বেলারাণীর থালার ভাতে এক ছোঁ মারিয়াছে। জপমালা খানিকক্ষণ রাগে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাহার পর দাঁত খিঁচাইয়া চাপা দাঁতের মধ্য দিয়া উচ্চারণ

করে— আমরণ রে ছেলের! তাহার পর তাহার এক হাতের উপরিভাগ ধরিয়া শূন্যে ঝোলাইতে ঝোলাইতে লইয়া যাইয়া কলতলায় ফেলে। তাহার পর তাহার উপর দুই চারি বালতী জল ঢালিতে ঢালিতে বলিয়া চলে, সব হাড়-মাস জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে বাবা! মরেও না সব; মরলে যে আমার হাড়ে বাতাস লাগে। কোথেকে সব কাল এসে জন্মেছে!

খোকার গায়ের জল মুছাইতে যখন জপমালা ব্যাপৃত তখন হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া যায় পাঁচ বছরের মিণ্টুর কথা—প্রায় এক ঘণ্টা হইল সে ওধারের কলে স্নান করিতে গিয়াছে। কথা ছিল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে মাথায় জল দিয়া তাহার মাতার কাছে আসিবে, আসিলে মাতা তাহার জল মুছাইয়া চুল আঁচড়াইয়া দিবে। এক ঘণ্টা হইতে চলিল সে এখনও জল লইয়া খেলা করিতেছে ভাবিয়া জপমালা রাগে দিশেহারা হইয়া তাহার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া যায়। বেলারাণী আর খোকার সব ঝাল যাইয়া পড়িল মিণ্টুর উপর। জপমালা, দাঁড়াও বাবা, তোমার একা একা চান করা বার করচি, বলিতে বলিতে যাইয়া ভেল শুদ্ধ মিণ্টুর পিঠে এক চড় বসাইয়া দেয়। বালুর উপর সামান্য জলে যেমন ইট ফেলিলে যেখানে ইট পড়ে সেখানটি ক্ষণেকের জন্য শুকাইয়া যায় এবং সেই জায়গার জল ছিটকাইয়া চারিধারে ছড়াইয়া পড়ে, মিণ্টুরও জলশুদ্ধ পিঠের অবস্থা তাহাই হইল।

— সেই কখন এসেচেন চান করতে এখনও চান হচ্চে, দেখ এইবার চান করার কি মজা! জপমালা মিণ্টুর পিঠে আরও দুই চার চড় বসাইয়া দেয়। মিণ্টু পিঠের জ্বালায় বিকট চিৎকার সুরু করে:

নিজে একটু আগে যখন মিণ্টুকে নির্দ্দয়ের মত প্রহার করিতেছিল তখন জপমালার প্রাণে একটুও মায়ার উদ্রেক হয় নাই। স্বামী মারিতেছে দেখিয়া এইবার তাহার মাতৃহৃদয়ের দয়া যেন উছলাইয়া পড়ে। সে বেলারাণীকে হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বলে, দেখ মা এইবার কেমন আরাম।

অধীর আরও মারিতে যায়। জপমালা রাগিয়া বলে, কি মেরে ফেলবে নাকি একেবারে? দাও, ছেড়ে দাও! অম্নি করে বুঝি মারতে আছে?—যেন অধীর কতই দোষী! তাই অধীর রাগিয়া বলে, এই তুমিই না শাসন করতে বল্লে—আবার তুমিই এসেছ ওকালতী করতে? এইবার আর যদি কোন দিন শাসন করতে বলবে ত' দেখবে!

জপমালা ঝাঁঝাইয়া উঠে, তাই বলে কি আমি মেয়েটাকে একবারে মেরে ফেলতে বলেছিলুম নাকি?

মিণ্টু যা প্রহার খাইয়াছিল তাহার শতাংশের একাংশও বোধ হয় বেলারাণী খায় নাই। তাহাতেই এত, নিজে মারিয়া ফেলিলেও কোন দোষ নাই স্বামী ছেলে মেয়েদের গায়ে একটু হাত দিলেই যত দোষ। অথচ শাসন না করিলেও মহা বিপদ! এই সব কারণে জপমালার সহিত অধীরের বেশ দুই চারিটি কথা কাটাকাটি হইয়া যায়। অধীর না খাইয়াই আপিসের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়ে।

অধীর আপিসে যাইবার জন্য বাসে উঠিল। জনতাবহুল বাসে সে এক কোণে নিজের বসিবার জায়গা করিয়া লইল। বাসের যাত্রীদের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অধীর ভাবিল, ইহারা সবাই সুখী। ইহাদের কি কখনও কোন দিন বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয় না? রোজই

কি ইহারা স্ত্রীর হাতে যত্নে বাড়া ভাত খাইয়া আপিসে যায়? অধীর বেশ করিয়া সকলের মুখাবয়ব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হঠাৎ সামনের দিকে আরসীতে তাহার লক্ষ্য পড়ায় সে অবাক হইয়া গেল। কই তাহার মুখেরও ত কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই! তাহার মুখ দেখিয়াও ত' বুঝিবার উপায় নাই যে, সে আজ বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া না খাইয়া আপিস যাইতেছে! অধীর ভাবে—বোধ হয় এই যাত্রীদের মধ্যেও তাহার মত হতভাগ্য দুই একজন আছে।

টিফিনের সময় অধীর ক্ষুধায় অস্থির হইয়া পড়ে। সে নিকটবর্ত্তী একটা হোটেলে যাইয়া ঢোকে। হোটেলে ঢুকিয়াই খাদ্য দ্রব্যের সৌরভে তাহার গা বমি-বমি করিতে থাকে। বয়দের চিৎকারে এবং লোকদের সোরগোলে তাহার বড় অস্বস্তি বোধ হয়। কোনরূপে আহার সমাপ্ত করিয়া তিন আনা দক্ষিণা দিয়া বাহিরে আসিয়া সে প্রতিজ্ঞা করে যে জপমালার সহিত যত ঝগড়াই হউক না কেন সে না খাইয়া জীবনে আর কখনও রাগ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবে না। এইবার জপমালার উপর তাহার একটু একটু করিয়া ভালবাসার উদ্রেক হয়। সে সকালের সব কথা ভুলিয়া যায়। আপিসে ফাইলের উপর সেই তের বছরের জপমালার গোল গাল সাদা ধপ্ধপে মুখটি ভাসিতে থাকে। লজ্জাবনত সেই তাহার চাহনি! ভয়ে ভয়ে স্বামীর সহিত কথা। কত ভাল লাগিত তাহার সেই বালিকা-বধূ জপমালাকে তখন। একবারও তাহাকে তাহার কাছছাড়া হইতে দিত না। সব সময় তাহার সহিত বসিয়া বসিয়া গল্প করার জন্য বৌদি "আঁচল-ধরা" বলিয়া কত ঠাট্টা করিতেন। বন্ধুরা সন্ধ্যার সময় আসিয়া চেঁচামেচি করিত—"বউ কি আর কারও হয় না?

সব প্রেম একসঙ্গেই শেষ করে ফেল্লে চলবে কেন? কালকের জন্যেও কিছু সঞ্চয় করে রাখ। সারাদিন ধরে কি মালা জপবে নাকি? অন্য কাজ আর করতে হবে না? এস আর মালা জপে কাজ নেই।” ইত্যাদি। তাহার পর বন্ধুরা জোর করিয়া ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে ঘর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইত। আর জপমালাকে উদ্দেশ করিয়া বলিত “বউদি একে এখন ছুটি দিন। এখন আমাদের পালা। আপনার সময় সেই রাত্রে, তখন ফিরিয়ে দিয়ে যাব।” জপমালা ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। লজ্জায় সে মরিয়া যাইত।

এদিকে জপমালাকে ছেলেরা সব জ্বালাতন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বেলা দুইটা হইবে। জপমালারও রাগ পড়িয়াছে। সে বসিয়া বসিয়া ভাবে সেই ছেলেবেলার কথা—যখন তাহার বিবাহ হইয়াছিল। ফুল-শয্যার রাত্রে যখন তাহার স্বামী আদর করিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া বলিয়াছিল, এদিকে ফের! আজ কি রাত্তির জান? আজ চুপ করে থাকতে নেই এ রাত্তির আর জীবনে আসবে না।

জপমালা লজ্জায় আধ-আধ সুরে উত্তর দিয়াছিল, জানি। তাহার পর অধীর তাহাকে যাহা করিতে অনুমতি করিয়াছিল সে তাহাই করিয়াছিল, কিছুতেই অমত করে নাই।

জপমালার আবার মনে পড়ে :—

স্বামী যখন কলেজে যাইতেন তখন তাহার কত ভাল লাগিত। তাহার মনে হইত—সে যদি ঐসব বড় বড় বই বুঝিতে পারিত! রোজ স্বামীর বই, খাতা, জামা, কাপড়, জুতা সে গুছাইয়া রাখিত। স্বামী তাহাকে কত ভালবাসিতেন। সারাদিন তাহারা দুইজনে গল্প করিয়া

কাটাইত, বন্ধুরা ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিয়া যাইত। তখন সে ছিল 'সব পাওয়ার' দেশে। তাহার কিছুরই অভাব ছিল না।

আজ সেই স্বামী না খাইয়া চলিয়া গেলেন ভাবিয়া জপমালার দুঃখের আর সীমা থাকে না। সে রাত্রের জন্য ভাল করিয়া সব রাঁধিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। কিন্তু অতীত দিনের স্মৃতি সব একে একে মনে পড়ায় তাহার রান্না যেন সব ওলট পালট হইয়া যায়।

রান্না সারিয়া জপমালা আজ নূতন কাপড় জামা বাহির করিয়া পূর্ব্বের মত বধূ বেশে সাজিতে আরম্ভ করিল। আজ সব পূর্ব্ব স্মৃতি মনে পড়ায় সে যেন এক নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রাণে আকাঙ্খা জাগিয়াছে। সে যে চারি সন্তানের মাতা তাহা সে আজ একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। অধীরও আজ তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরে, কারণ তাহারও অবস্থা তাহাই। সে আজ জপমালাকে সেই তের বছরের বধূর মতই পাইতে চায়। তাহার মুখ হাত ধোয়া হইতে না হইতে জপমালা গামছা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। হাত মুখ ধুইতে ধুইতে অধীর ভাবিতেছিল—আজ কখন কেমন করিয়া জপমালার সহিত দেখা হইবে, কে জানে! আর কি বলিয়াই বা সে তাহার সহিত কথা সুরু করিবে! জপমালাকে এই অবস্থায় দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। তাহার হাত হইতে গামছাটা লইয়া সে মুচকি হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিল, আজ যে বড় সাজগোজ হয়েছে দেখচি? বুড়ো বয়সে কি সখ উথলে পড়চে নাকি?

জপমালা ঘাড় বাঁকাইয়া বলে, আহা, বুড়ো হ'লে বুঝি আর সখ হ'তে নেই? আর এর মধ্যেই বুঝি আমি বুড়ো হয়ে গেলুম? এইত মাত্র আমার বয়স বাইশ বছর। এর মধ্যেই বুঝি কেউ বুড়ো হয়ে যায়?

মেয়েদের স্বভাবই এই। বয়স হইলেও বয়সের গরব করিতে ছাড়ে না।

অধীর ঈষৎ হাসিয়া বলে, তা নয়ত আবার কি? মেয়েদের কি বলে জান? কুড়ি পেরুলেই...।—সে থামিয়া যায়।

জপমালা—বেশ, বেশ এখন খাবে এস দিকিন—বলিয়া তাহাকে খাইবার ঘরে ডাকিয়া লইয়া যায়।

খাইবার সরঞ্জাম দেখিয়া অধীর অবাক হইয়া যায়। সে বলে, সকালের শোধ তুলে নেবে নাকি?

জপমালা বিরক্ত হইয়া বলে, নাও, আর বকতে হ'বে না—এখন ভাল মানুষের মত খেতে বস দিকিন্।

অধীর জপমালাকে আবার রাগাইবার জন্য বলে, দেখ, ছেলেদের শাসন করে করে তোমার শাসন করা যেন স্বভাব হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ, আমি বুঝি শাসন করলুম? খালি ত খেতে বল্লুম।

অধীর খাইতে সুরু করিল। জপমালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁগো, মাছের কালিয়াটা কেমন হয়েছে গো?

—খুব ভাল।

—খুব ভাল মানে?

—খুব ভাল মানে, খুব ভাল। একটুও নুন নেই, নুন বাদে সবই ঠিক হয়েছে।

জপমালার মাথায় যেন বাজ পড়িল। সে আঁৎকাইয়া উঠিল, তা হ'বে, কি যে ছাই সব আবোল-তাবোল ভাবছিলুম। তখনই মনে হ'ল, যেন নুন দিইনি। যাক্, ওটা রেখে দাও আর খেতে হ'বে না।

—খেতে হ'বে না ত কি? জিনিষটা ফেলা যাবে?

—তা' যাক্।

—না না, তাই কি হয়?

—খুব হয়! ওটা যদি খাও ত' আমার মাথা খাও।—সে দিব্যি দিয়া বসে।

অধীর মজা করিবার জন্য বলে, আচ্ছা, তোমার মাথাই খাব। দেখি, এদিকে তোমার মাথা নিয়ে এস, এস এই এখানে :

জপমালাও কম নয়, সে মাথা হেঁট করিয়া আগাইয়া দেয়। তাহার মাথার ঘোমটা খসিয়া পড়িয়া যায়। তাহা হইতে সুবাসিত তৈলের গন্ধ বাহির হইয়া অধীরকে মাতাল করিয়া তোলে। অধীর বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়া তাহার মাথার একগোছা চুলে টান দেয়। উঃ করিয়া জপমালা মাথা সরাইয়া লয়। তাহার পর মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া খোঁপার কাঁটাটা ভাল করিয়া গুঁজিতে গুঁজিতে বলে, ঐ বুঝি মাথা খাওয়া হ'ল? ওর নাম বুঝি মাথা খাওয়া?

—এতেই এত! খেলে কি না হ'ত?

—খাও না, বলিয়া জপমালা আবার মাথা আগাইয়া দেয়।

এই রকম করিয়া অধীরের খাওয়া শেষ হইয়া আসে। জপমালা আবার তাহাকে প্রশ্ন করে, আচ্ছা চা'নিটা কেমন হয়েছে গো? অধীর ইচ্ছা করিয়াই চুপ করিয়া থাকে। উত্তর দেয় না। সে ভাবে যার এরকম কোমল হৃদয়, সে কি করিয়া ছেলে মেয়েদের অমন করিয়া প্রহার করে, কটু গালাগালি দেয়? সত্যই জ্বালাতন হইয়া সে ঐরূপ হইতে বাধ্য হয়, তাহার কোন দোষ নাই। তাহা না হইলে তাহার

মনের ভিতর দেখিতেছি আজও সেই তের বছরের সরলমনা জপমালাই রহিয়াছে।

অধীরকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া জপমালা জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা বলবে না ত'? আমার কি, যা-তা রান্না হ'বে। আজ নূন কম হয়েচে জানতে পারলে কাল নূন বেশী করে দিতুম, আর আজ টক বেশী হয়েছে জানতে পারলে কাল টক কম করে দিতুম। এম্‌নি করে রান্না ঠিক হয়ে যেত।

এইবার অধীর বলে, ও বড্ড জানবার ইচ্ছে হয়েছে, নয়? আমি কিন্তু কানে কানে বলব, এদিকে এস। জপমালা মুখ আগাইয়া লইয়া যায়। ক্ষণেকের মধ্যে অধীরের চাটনি-শুদ্ধ ঠোঁট জপমালার ঠোঁটে লাগিয়া যায়। সে মুখ ঘুরাইয়া লইয়া ঈষৎ রাগের ভান করিয়া বলে, ছিঃ ছিঃ, বুড়ো বয়সে এখনও তোমার দুষ্টুমি গেল না? ছেলেরা যদি দেখে ফেলে?

ওদিকে খোকার তখন ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। মাকে কাছে দেখিতে না পাইয়া সে বিকট চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। জপমালা মুখে একটু জল দিয়া খোকার কাছে ছুটিয়া চলিয়া যায়। মুখ ধুইয়া অধীর শুইবার ঘরে আসিয়া দেখে জপমালা খোকাকে স্তন্য পান করাইতেছে। সে কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়ে, কারণ এখন আর তাহার স্ত্রীর উপর অধিকার নাই। সে জননী মূর্ত্তিতে বিরাজমান।

অধীর বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিতে থাকে—এই তো জীবন! যেখানে স্বামী-স্ত্রীর আহ্বান সেখানে জননীর আহ্বান আসিয়া সব ব্যর্থ করিয়া দেয়।

সুশী-দি'

বিশ বছর আগে কুর্ম্মহাটা ছিল মাত্র সামান্য একটা গ্রাম। তারপর জলপথে এবং স্থলপথে মালপত্র আদান প্রদানের সুবিধা থাকায় কতকগুলি মিল স্থাপিত হওয়ার পর এখন কুর্ম্মহাটা বেশ একটা ছোট সহরে পরিণত হয়েছে। পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটি ছিল না এখন মিউনিসিপ্যালিটি হয়েচে। সঙ্গে সঙ্গে পথ ঘাটও কিছু ভাল হয়েচে।

যেদিন এই মিউনিসিপ্যালিটির লোক ঢোল বাজিয়ে ঢেড়া দিল যে, সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য একজন পাশ করা মিডওয়াইফ বা ধাত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে তখন সহরময় বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ স্বপক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করেছিল, কেউ আবার বিপক্ষে দু'চার কথা বলেছিল। কেউ বল্লে, যাক্, এ চেয়ারম্যানটা নিমকহারাম নয় তবু দু'টো বড় কাজ করলে—হাই স্কুলটা করে দিলে তারপর এই ধাই নিযুক্ত করলে। কেউ বিপক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করে বল্লে, জাননা ত, আর বছর কি হয়েছিল। চেয়ারম্যানের পত্নীর কি হয়েছিল। কেবল সেই জন্যে হ্যাঁঃ, কত বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটি একটা ধাত্রী রাখতে পারে না আর সামান্য কুর্ম্মহাটা রাখবে চল্লিশ টাকা মাইনে দিয়ে একটা ধাই।

আর একজন স্বপক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করে বল্লে, তা যাই হোক, ওসব দেখবার আমাদের দরকার কি। আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর

কেন বাবা? এবার প্রসূতিগুলি ত মানুষমারা ধায়ের হাত থেকে বাঁচবে! অপর এক ব্যক্তি আবার দু'ট বিপক্ষে বলতে ছাড়ে না, বলে—হুঁ্যাঃ, এই পাশ করা ধাই-ই মানুষ মারে বেশী। আমাদের দেশী ধায়ের তবু একটু ভয় থাকে। পাশ করা ধায়ের ত আর সে ভাবনা নেই। তাদের সাত খুন মাপ। তারপর দক্ষিণার ব্যবস্থাটা দেখেছ? নগদ দু'টি টাকা। আট আনা এক টাকার জায়গায় নগদ দু' টাকা। যে দু' টাকা দিয়ে ধাইকে আনতে পারবে, সে ত কলকাতা থেকে ধাই আনাবে। গরীবের পক্ষে যে আঁধার সেই আঁধারই রে।

ঢেড়ার দশ পনের দিন পরে যখন সদর রাস্তায় একটা ছোট সাইনবোর্ডে লেখা দেখা গেল—"সুশীলাবালা দাস—ধাত্রী, কুর্ম্মহাটা মিউনিসিপ্যালিটি" তখন সকলের দৃষ্টি সেই দিকেই আকৃষ্ট হ'ল। ধাত্রীটি দেখতে কেমন, তার হাব ভাব কেমন এবং কেমন কার্য্য করেন তাই দেখবার জন্যে এখন সহরের সকলেই উদগ্রীব!

মাস খানেকের মধ্যে ধাত্রীর জীবনের আদর্শ দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। এমন করে অনাড়ম্বর জীবনের মধ্য দিয়ে নিজেকে এতখানি পরের জন্যে যে কেউ বিলিয়ে দিতে পারে তা কেউ ধারণাই করতে পারে না। যখন বাড়ীতে থাকতেন তখন তাঁর পরণে থাকত সামান্য মাত্র একখানা ধুতি। যখন 'কলে' যেতেন তখন তাঁর পরণে থাকত—একখানা চওড়া কালা পাড় ধুতি, পায়ে চাকরীর খাতিরে না পরলে নয় বলে এক-জোড়া হিলওলা জুত আর মাথার চুলে বাতে জটা না ধরে তারই দিকে লক্ষ্য রেখে কেবল ব্যবস্থা। তাঁর বেশীর ভাগ দিনই সমস্ত রাত্রি কাটত অনিদ্রায়, উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে প্রসূতির পাশে বসে। দিনের বেলায়

একটু অবসর থাকত ; সেই সময় পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এসে জুটত তাঁর কাছে। কেউ বলত, মাসী। আবার কেউ বলত, পিসী। যার যা ইচ্ছে সে তেমন সম্বোধন করত, কিন্তু সাধারণ ভাবে তিনি সুশীদি বলেই পরিচিত ছিলেন। তিনি এই সব ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে, তাদের উপদেশ দিয়ে, হাতে শিখিয়ে তাঁর সময় কাটাতেন। আর এরই মধ্যে অবসর করে বাড়ীর কাছে যে একটা অরফেনেজ ছিল তাতে গিয়ে সাধ্যমত ছেলেমেয়েদের সেবা শুশ্রূষা করে আসতেন। নিজের পরিশ্রমের যত কিছু উপার্জ্জিত টাকা সমস্তই তিনি ঐ অরফেনেজে দিতেন। পরে তাঁরই নামে ঐ অরফেনেজ উন্নতির চরম শীর্ষে উপনীত হয়েছিল। ঘরে তাঁর কোন আড়ম্বর ছিল না। কেবল শোবার ঘরে একটা খাট আর দেওয়ালে সযত্নে টাঙ্গান একটা ফটো। সেই ফটোয় দেওয়া থাকত রোজ একটা করে তাজা ফুলের মালা। একবার এই ফটোটির কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছিলেন যে, ওটি তাঁর দাদার ফটো। তিনি তাঁকে খুব ভালবাসতেন তাই তাঁর ফটোটা তিনি অত যত্ন করে তুলে রেখেছেন।

এই সমস্ত সহস্র সহস্র গুণে বিভূষিতা হ'লেও সুশীদির দোষ ছিল একটি। সকাল ৫টা থেকে ৮টা পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর কোন সম্পর্ক থাকত না। প্রসূতি মরে যাক্ ক্ষতি নেই। কারও ঐ সময় ঘরে আসবার হুকুম ছিল না। চাকুরী থাক বা না থাক ঐ সময় তাঁর ছুটি চাই-ই। এই জন্যে একবার চাকুরী নিয়ে খুব গোলযোগ হয়েছিল, কিন্তু তাঁর কর্ম্ম ও চরিত্রগুণে কেউ তাঁকে তাড়াতে রাজি হন নি বা সাহস করেননি। সাধারণের জন্যে তিনি যা করতেন এবং তারা যে পরিমাণে তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করত তা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়।

দিন দিন সুশীদির শরীর শীর্ণ এবং চোখের কোণে কাল দাগ পরিস্ফুট হওয়াতে সকলে তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং তাঁকে সকলে অনুরোধ করল যে, তিনি অন্ততঃ মাস দু'য়েকের ছুটি নিয়ে কোথাও ঘুরে আসুন। তা না হ'লে তাঁর শরীর ভেঙ্গে গেলে তাঁদের কি হবে, অরফেনেজই বা কোথায় যাবে। আর সকলের চিরকাল একটা দুঃখ থেকে যাবে যে, তাঁদের জন্যেই তাঁর শরীরের এই হ'ল অবস্থা।

সুশীদি কিন্তু সে কথায় কাণ দিলেন না। কারণ যদি পরিশ্রমের ফলে তাঁর শরীরের অবস্থা ঐ হত তা হলে বোধ হয় তিনি নিজেই ছুটি নিতেন কাউকে বলতে হ'ত না; কিন্তু তাঁর শরীর খারাপের হেতু কেউ জানে না, আর এই ব্রত গ্রহণ করে পরের জন্যে কেন যে জীবন উৎসর্গ করা তাও কেউ জানে না! সুতরাং তিনি পরের কথায় মৌন থেকে দিন রাত নিজের কর্ত্তব্য করে যেতে লাগলেন।

শেষে সকলে সবই জানতে পারলে এবং তা ভগবানের কৃপায় নচেৎ বোধ হয় পৃথিবীর কেউ এই সন্ন্যাসিনী ব্রতচারিণীর কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারত না।

একদিন সকালে নিষিদ্ধ সময়ে মিউনিসিপ্যালিটির এক কমিশনার তাঁর পত্নীর জন্য সুশীদিকে ডাক দিতে বাধ্য হন। তিনি যদিও জানতেন যে শত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি এ সময়ে আসবেন না তবুও একবার চেষ্টা করে দেখা দরকার ভেবে তিনি নিজে গিয়ে সুশীদির বাড়ীতে উপস্থিত হ'লেন এবং ঘরের দোর ঠেলতেই সব ব্যাপার দেখে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন।—এক আলুলায়িতকুন্তলা উন্মাদিনী নারী মূর্ত্তি! তার সামনে একটা ফটো আর কতকগুলো টাটকা ফুল ছড়ান।

তাঁকে দেখেই সেই বিহ্বলনেত্রা নারী ক্ষিপ্রগতিতে উঠে কর্কশ স্বরে চিৎকার করে উঠল—কেন আপনি এ সময় এলেন? আপনাদের শত সহস্র বার বারণ করা সত্ত্বেও তবু, তবুও কেন?...তারপর সামনে ফটোখানা বুকের মধ্যে চেপে ধরে সুশীদি বিছানায় গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রুদ্ধশ্বাসে কাঁদতে লাগলেন।

কমিশনার সাহেব ব্যাপার দেখে অবাক। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বল্লেন, এযে আমাদের অভয়াপদর ফটো! আমরা এক সঙ্গে কলকাতায় স্কুলে দু'জনে পড়েছিলাম তা'পর সব ছাড়া ছাড়ি। অনেক দিন তার খবর পাইনি। তারপর শুনলুম যে, কোন্ এক বিধবাকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে এবং তাকে ধাত্রীবিদ্যা শিখিয়ে উপায়ক্ষম করে দেবার ভার গ্রহণের দণ্ড স্বরূপে তাকে দেশ, ধর্ম্ম, সমাজ, মাতা, পিতা, ভাই, বোন সব ত্যাগ করে পশ্চিমে কোন্ এক জায়গায় চাকরী নিয়ে চলে যেতে হয়েছিল। তারপর একদিন সে নাকি সেই ধাত্রীর একটা চাকরী করে দেবার জন্যে কলকাতায় আসার পথে ট্রেণ দুর্ঘটনায় মারা যায়। আপনিই কি সেই ধাত্রী?

কোন উত্তর আসে না কেবল শোনা যায়, উচ্ছসিত চাপা ক্রন্দনের শব্দ। একেই বলে, হাসিতে প্রেমের আরম্ভ ক্রন্দনে তার পরিসমাপ্তি। বিদেশী ভাষায় বলতে হ'লে বলতে হ'বে Lovo is enternal আর আমাদের কবির ভাষায় বলতে হ'লে বলতে হ'বে- 'পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে।'

মডার্ণ-চেম্বার

যখন সে নিতান্ত বালক, পৃথিবীর কিছুই জানত না তখন তার বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, "হ্যাঁরে ভব, তুই বড় হয়ে কি হবি ?"

'বড় হয়ে কি হবি', এর মানে ভবতোষ আদৌ উপলব্ধি করতে পারত না। সে পিতার দিকে একবার অসহায়ের মত চেয়ে আবার তার মুখ নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত।

ভবতোষের পিতা ছেলের বুদ্ধির অভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে একটু জোর গলাতেই বলতেন, "ইঞ্জিনিয়ার হবি, না ডাক্তার হবি, না কি হবি ?"

এইবার ভবতোষ বুঝতে পারে, সে আনন্দ-লজ্জাজড়িত ভাবে এবং ভাষায় চট্ করে উত্তর দেয়,—"আমি ডাক্তার হব।"

ডাক্তারীতে ছেলের ঝোঁক মন্দ নয় ভেবে ভবতোষের বাবা আনন্দিতই হন।

ছেলেবেলা থেকেই ভবতোষের ডাক্তারীর উপর ঝোঁক থাকায় সকলেই তাকে ডাক্তার বিধান রায়, নীলরতন সরকার ইত্যাদি বলে যার যা ইচ্ছা তাইতেই তাকে অভিহিত করত।

পরে সে যখন আই, এস্-সি পাশ করল তখন তার ডাক্তারী পড়ার

ঝোঁকটা আরও একটু উৎকট হয়ে দাঁড়াল। সে দিন রাত স্বপ্ন দেখত —লাল লাল, সাদা সাদা সব নার্শ, নীলবর্ণ তাদের দু'টি করে চোখ আর মখমলের মত নরম দেহ, তার উপর বিচিত্র তাদের বেশ ভূষা আর অঙ্গসৌষ্টব। এদের সঙ্গে সে চলাফেরা করবে, হাসবে, ঠাট্টা-তামাসা করবে, কাজ করবে তবেই তো তার জীবন সার্থক হ'বে। হয়ত বা কোন নার্স ডিউটির সময় তার সঙ্গে রোম্যান্স করবে। মেডিকেল কলেজে যে যুবক না পড়ে তার জীবনই বৃথা।

মেডিকেল কলেজের লুব্ধ ছ'টি বছর যখন ধীরে ধীরে কেটে গেল তখন ভবতোষ হ'ল একজন নামজাদা ডাক্তার—ভবতোষ দত্ত, এম, বি।

তার সম্মুখে এখন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, নব নব আশা। সে এখন তুচ্ছ করে সামান্য মেডিকেল কলেজের নার্সদের। সে হ'তে চলেছে একজন বিধান, নয় নীলরতন। কত নার্স তার কাছে এসে পায়ে ধরে সাধাসাধি করবে কেস দেবার জন্যে!

আস্তে আস্তে উন্নতি করবে ভেবে সে মধ্যবিত্ত গোছের একটা ডিস্পেন্সারী খুলে বসল লেক অঞ্চলে। সে তুচ্ছ করে শ্যামবাজার বা শিয়ালদহের বা কলেজ ষ্ট্রীটের লোকদের, তারা কি জানে এটিকেট! তারা কি জানে তার মত যুবক ডাক্তারের কদর! লেক থেকে কত উর্ব্বশী মেনকা আসবে তাকে অভিনন্দন করতে, ধন্য হ'তে তার চিকিৎসায়। সে যেন বসে থাকবে সেখানে স্বর্গের সুধা নিয়ে আর তাই বিতরণ করবে সব নন্দন কাননের নারীদের মধ্যে আর তার পরিবর্তে সে পাবে মৃদু মধুর কোমল ঠোঁটের স্পন্দন আর চকিত নয়নের অত্যদ্ভুত গতি!

হিটলারের পতন

ধীরে ধীরে মাসের পর মাস কেটে গিয়ে বারটি মাস কেটে গেল। উর্ব্বশী মেনকা ত' দূরের কথা স্বর্গের কোন অপ্সরীই ক্ষণেকের তরে ভবতোষের সুধার লোভে তার ডিস্‌পেন্সারাতে দেখা দিল না।

ভবতোষ এইবারে চোখের সামনে দেখতে পেল যে, তার আশা দুরাশায় পর্য্যবসিত হ'তে চলেছে। সে ভাবল—না:, কলকাতায় কার ক'টা রোগ হয় যে ডাক্তার দেখাবে। তার চেয়ে বরং স্কুল কলেজের সব ছাত্রীদের প্রত্যেকেরই চশমার দরকার হয়। সে ঠিক করল যে, সে অপটিশিয়ন্ আর ডেণ্টিষ্ট হ'বে। উঠে পড়ে লেগে গেল ঐ দুই জিনিষ শেখবার জন্যে। তিন বছর শিক্ষার পর সে যখন ক্লান্ত দেহ নিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে বেরিয়ে এল কলেজের গণ্ডী থেকে তখন তার আর আনন্দ ধরে না! সে আবার কল্পলোকে বিচরণ করতে লাগল। সে কল্পনা করতে লাগল যে, এইবার শেষ চেষ্টা! সে মস্ত বড় এক চেম্বার করবে 'চৌরঙ্গীতে', সে হ'বে চৌরঙ্গীর রাজা। সে কাবলীওয়ালার কাছে দেনা করেও এমন চেম্বার করবে যা চৌরঙ্গীর কোন বিলাত-ফেরত ডাক্তারেরও নেই। কত লেডি আসবে তার চেম্বারে, একেবারে ভিড় লেগে যাবে। কত লোককে সে ইচ্ছা করে ফিরিয়ে দেবে। অত বড় ডাক্তার কি একদিনে অত খাটতে পারে! কত মহিলা তাদের চক্ষুরত্নের জন্যে ডবল ফি দিয়ে তাকে হাতে ধরে সাধাসাধি করবে। তারপর লেডি পেসেণ্ট পেলে পুরুষ পেসেণ্টকে সে আর দেখবেই না, হয়ত বা লিখে দেবে 'ফর লেডিজ ওন্‌লি।' কত মেয়েকে সে কত প্রশ্ন করবে হয়ত বা এমন একটা ঘোরালো মেয়ে আসবে যে হাঁ-কে না করবে অথবা নাকে হাঁ করবে, তারপর বলবে, 'চশমা তাকে মোটেই ফিট্

করেনি ; ইত্যাদি। তখন সে কি করবে! আর যদি কোন লেডি দাঁতের রোগ নিয়ে আসে তাহ'লে যা মজা হ'বে! নরম তুলতুলে তার গাল স্পর্শ করে সে ধন্য হ'বে, মেয়েটি হয়ত লজ্জায় বা ভয়ে তার গালে হাত দিতে দেবে না কিন্তু সে বুঝিয়ে বলবে যে সে ডাক্তার— তার কাছে কোন লজ্জা বা ভয়ের কারণ নেই। তারপর সে তার দাঁত পরীক্ষা করে দেখবে আর মেয়েটিও বাধা দেবে না।

চৌরঙ্গীর উপর একটা মস্ত বড় ঘর নিয়ে তাকে চার ভাগে ভাগ করা হ'ল—একটা হ'ল 'জেনারেল ওয়েটিং রুম' একটা হ'ল 'লেডিজ্ ওয়েটিং রুম' একটা হ'ল 'ডেণ্টাল রুম' আর একটা হ'ল 'আই টেষ্টিং রুম'। পাঁচ সাতশ টাকায় হবে ভেবে বাবার কাছে সে যা নিয়েছিল তাতেও কুলাল না। তখন পিতার অবর্ত্তমানে তার সম্পত্তির অংশ দেখিয়ে সে পাঁচশ টাকা ধার করলো কাবলীওয়ালার কাছে। কিন্তু হায়! তাতেও সব কুলাল না। ম্যাটিং আয়না ইত্যাদি কয়েকটা জিনিষ বাকি রয়ে গেল। ভবতোষ ভাবলে—যাক্, আলমারী চেয়ার ইত্যাদি যা হয়েছে তা তার আশারও বাইরে এখনও বাকি যা আছে তা থাক আর ধার করে দরকার নেই, দু একটা পেসেণ্ট পেলেই তারপর ওগুলো সব করিয়ে নোব। যত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয় সে তাদের কার্ড দেয়, সকলকে নিয়ে আসে তার চেম্বারে, তারপর ভাইস্‌রয় বা গবর্ণর কোথাও পরিদর্শনে গেলে যেমন সেখানকার কর্ত্তা সাদরে এবং আগ্রহের সঙ্গে সব কিছু দেখাবার ত্রুটি করেন না তেমি ভবতোষও তার চেম্বারের কোন কিছু দেখবার ত্রুটি করে না। বন্ধুরা ঈর্ষায় মরে যায়, ভাবে—ওঃ, এটা মানুষ হয়ে গেল, ছেলেটার কপাল ভাল!

দিনের পর দিন ক্যালেণ্ডার আর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কেটে যায়, কিন্তু যথা 'পূর্ব্বং তথা পরং'। সেই একঘেয়ে জীবন নিরাশায় ভরা— সকাল থেকে সন্ধ্যে, সন্ধ্যে থেকে সকাল—খালি নিখুঁত অভিনয়। আশার আলোক যখন ক্ষীণ এমন কি নির্ব্বাণোন্মুখ, মন যখন বিষাক্ত, চেম্বার যখন বিতৃষ্ণায় ভরা তখন একদিন হঠাৎ আশার আলোক দপ্ করে জ্বলে উঠল। তখন সবে মাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। হঠাৎ বয় এসে খবর দিলে—একজন জেনানা লোক তাকে ডাকছে। ভক্তের কামনা ভগবান পূর্ণ করেন, অনেষ্ট লেবার কখনও বৃথা যায় না—তার ফলই এই হাতে হাতে পাওয়া গেল ইত্যাদি ভেবে সে তড়াক্ করে উঠে গেল সেই লেডিকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে

মহিলাটি ভবতোষকে দেখেই নমস্কার করে বল্লেন -দেখুন আমি এই নার্সেস্ ইউনিয়নে থাকি যদি দয়া করে দু একটা কেস্ দেন

ভবতোষের মাথার আর চোখের সামনে তখন পৃথিবী ঝাপ্সা হয়ে এসেছে একটু পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্লে আপনি নার্স ?

পুরুষ হ'লে সে বোধ হয় সেদিন তাকে মেরেই বসত! কিন্তু নারী বলে সে আর অতদূর অগ্রসর হ'তে পারলে না, অবজ্ঞার সুরে সে বল্লে, আচ্ছা, রেখে যান আপনার ঠিকানা।—বলে সে দরজা ঠেলে নিজের রুমে ঢুকে দেহটাকে এলিয়ে দিলে তার চেয়ারে।

এমনি করে দিনের পর দিন অভিনয় করা অথচ একটি পয়সা উপার্জ্জন নেই এ যে মানুষের-পক্ষে কত কষ্টকর তা সকলেই জানেন। প্রথম প্রথম হয়ত নিজের বাহাদুরী জাহির করতে খুব ভাল লাগে কিন্তু পরে যখন পাওনাদারদের তাড়না আসে তখন আর সে সবের মোহ থাকে না।

দেনায় মাথা ডুবে গেছে টাকা দিতে না পারলে হয়ত কাবুলীওয়ালার হাতে মার খেতে হবে, সুতরাং আর 'চেম্বার' রক্ষা করা অসম্ভব—এই সব ভাবনায় যখন ভবতোষ সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে মগ্ন তখন আবার আবির্ভাব হল এক নারীর। সে বয়কে বল্লে, মহিলাটি নার্স না কি জিজ্ঞাসা করবার জন্যে।

বয় এসে খবর দিলে যে মহিলাটির যা দরকার এবং তিনি কে তা তিনি তাকেই বলবেন। যখন আত্মপরিচয় দিতে কুণ্ঠিত তখন এ নিশ্চয় নার্স ভেবে ভবতোষ রেগে আগুন হয়ে উঠল, সে ঠিক করলে যে আজ সে তাকে মেরে তাড়াবে। তাকে নিজেকে কে পেসেণ্ট দেয় তার ঠিক নেই, সে দেবে পরকে!

মহিলাটিকে দেখেই তার ভ্রম ভেঙ্গে গেল! এমন ভদ্রমহিলাকে সে নার্স বলে ভেবেছিল! যথোচিত সম্ভাষণ করে ভবতোষ এই দুর্লভ নারী রত্নটিকে নিয়ে গেল 'লেডিজ্ ওয়েটিং রুমে', তারপর একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে তাঁকে বসতে অনুরোধ করল।

মহিলাটি একটু ইতস্ততঃ করে বসে পড়লেন চেয়ারে। ভবতোষও একটা চেয়ার এগিয়ে নিয়ে পর্দ্দাটা টেনে দিয়ে তাঁর সামনে এসে বসল, তারপর সুরু হ'ল তাদের অর্থাৎ ডাক্তারে আর রোগীতে কথাবার্ত্তা, ছোট্ট রঙ্গিন পর্দ্দার অন্তরালে।

ভবতোষ জিজ্ঞাসা করলে, আপনার কি হয়েছে?

মহিলাটি একবার দেওয়ালের এধার ওধার চেয়ে বল্লেন, আপনার আরসী নেই?

ভবতোষ মহা বিপদে পড়ল, সব করলে আর ঐটের দরকার নেই

ভেবে সে করলে না, আর প্রথমেই ওর খোঁজ! সে ঢোঁক গিলে বল্লে, দেখুন, আরসীটা কাল বাই-চান্স পড়ে ভেঙ্গে গেছে।

মহিলাটি বল্লেন, ওঃ আচ্ছা, ও জিনিষটার টোয়েন্‌টিয়েথ্‌ সেঞ্চুরিতে বড় দরকার, ওটার আজকেই ব্যবস্থা করবেন।—বলে নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা ছোট আয়না বার করে নিজের মুখের সামনে ধরে মুখটা ঈষৎ ফাঁক করে দাঁতে দাঁতে চেপে বল্লেন, দেখুন ত আমার এ দাঁতটায় কি হয়েছে, দাঁতটা কেমন সি-সিড়, সি সিড় করে।

ভবতোষ দূর থেকে একটু আলগোছে দেখবার ভাণ করল, কিন্তু দেখতে পেল না।

মহিলাটি ব্যাপার দেখে হেসে বল্লেন, অতদূর থেকে কি দেখতে পাওয়া যায় এই ছোট্ট আরসীর মাঝে? এই আমার মুখের পাশে আসুন, তবে দেখতে পাবেন।

উপায় নাই, অগত্যা ভবতোষকে আসতে হ'ল কথামত। নারীর অঙ্গসৌরভ আর রেশমী কেশের সুগন্ধে তার প্রাণ মাতাল হয়ে উঠল। আরসীর দিকে চাইতেই মহিলাটির চোখের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। লজ্জায় ভবতোষ চোখটা ফিরিয়ে নিলে, মহিলাটি একটু মুচকী হাসলেন। সে হাসিতে লুকান ছিল সাত রাজার ধন। তারপর বল্লেন, কি, চোখ ফিরিয়ে নিলেন কেন? লজ্জা হচ্ছে বুঝি? বলে হেসে আরসীটা উল্টে কোলের উপর রেখে দিলেন। তারপর আবার আরসীটা মুখের সামনে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, দেখুন, ভাল করে দেখুন, এই যে এই দাঁতটা! —বলে মহিলাটি আঙ্গুল দিয়ে একটা দাঁত দেখিয়ে দিলেন।

দাঁত দেখা না হ'লেও ভবতোষ স্বীকার করল যে হয়েছে।

আরসীটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে মহিলাটি উঠে দাঁড়ালেন। বল্লেন, আজ আপনাকে রোগের কথা বলে গেলুম। আজ রাত হয়ে গেছে, আজ আর এর ট্রিটমেন্ট হবে না। আপনি সব ওষুধ-পত্তর ঠিক করে রাখবেন, আমি কাল আসব. নমস্কার —বলে ছোট কোমল হাত দু'টি তুলে কপালে স্পর্শ করেই মহিলাটি বেরিয়ে যাবার জন্যে যেমন পা বাড়াবেন অমনি মেঝের একটা ফাটলে জুতার ডগা লেগে হোঁচট খেলেন। ভবতোষ 'দেখবেন', 'দেখবেন' করে তাঁকে দু'হাত দিয়ে ধরে ফেল্ল। মহিলাটিও একটু লজ্জাজড়িতভাবে নিজেকে ভবতোষের বাহুতে এলিয়ে দিলেন। নিজের দোষেই এই বিপত্তি ভেবে ভবতোষ মরমে মরে গেল। সব হ'ল আর ম্যাটিংটা করাতে তার কি হ'ল! ভেবে ভবতোষ লজ্জা-জড়িতকণ্ঠে বল্লে. লাগেনি ত' ?

মহিলাটি একটু রাগের ভান করে বল্লেন, লাগবে না ত কি! মেঝের যত সব খানা ডোবা, একটু ম্যাটিং দিয়ে ঢাকতে পারেন নি? যত সব মানুষ খুন করবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন!

ভবতোষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে মহিলাটির পায়ের বুড়ো আঙুল হাত দিয়ে টিপে ধরে বল্লে, দাঁড়ান দাঁড়ান, একটু টিন্‌চার পেণ্ট করে দিই, তা নইলে ব্যথা হতে পারে। আর আমার কি দোষ বলুন. বেটা ম্যাটিংওলা আজ তিন দিন ধরে ম্যাটিংখানা রিনিউ করে দিচ্ছে! যত সব ইণ্ডিয়ান কনসার্ণের কাজ!

মহিলাটি অবজ্ঞার সুরে পা ছাড়িয়ে নিয়ে খট্‌মট্‌ করে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে চলে গেলেন। ভবতোষের মনে হ'ল যে, সে একবার ছুটে যায়, গিয়ে তার মানভঞ্জন করে আসে কিন্তু সে তা পারল

না, যেমন বসেছিল পায়ে হাত দিয়ে তেমনি খানিকক্ষণ বসে থেকে নিজের রুমে গিয়ে ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল। প্রথম খদ্দেরকে, তাতে আবার মহিলা খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করতে পারল না ভেবে সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। তারপর হন্ হন্ করে কোথায় বেরিয়ে গেল। কিনে আনল কুড়ি টাকা দিয়ে এক আরসী আর দিয়ে এল অর্ডার ম্যাটিংএর।

পরের দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে ভবতোষ বসে থাকে সন্ধ্যার আশায়। ঘড়ির কাঁটা মন্থর গতিতে চলে আজ যেন তাকে উপহাস করে। সন্ধ্যা হয়-হয়, প্রতি পদশব্দে ভবতোষ সচকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি আটটা বাজে, ভবতোষ নিরাশ হয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে বসে আছে। এমন সময় আবির্ভাব হল দরজা ঠেলে সেই মহিলার। ভবতোষ ধড়মড়িয়ে উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করে। মহিলাটি হেসে বল্লেন, কি ভাবছিলেন বসে বসে ডাক্তার বাবু, বাড়ীর কথা? বাড়ীতে আপনার কে আছে? আপনি বিয়ে করেছেন?

ভবতোষ বলে, ও সমস্ত বাঁধাবাঁধি আমার ধাতে পোষায় না। আমি চাই বন্ধনহীন ভালবাসা তাই বিয়েতে আমার এ বয়স পর্য্যন্ত লোভ হয়নি। তা আপনার সব ঠিক করে রেখেছি।—বলে ভবতোষ একটা সিগারেট ধরাল। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বল্লে, দেখুন, আপনার ত' এতে কোন অসুবিধে হবে না?

মহিলাটি হেসে বল্লেন, ও, সিগারেট খাওয়াটাকে বলছেন? ওতে আর কি, ও ত এখন মেয়েরাও খেয়ে থাকে। আমাকেও যদি একটা পলমল অফার করতে পারেন ত ভাল হয়।

প্রথমটা ভবতোষ একটু অবাক হয়েছিল তারপর এরিস্টক্র্যাটিক ঘরে সবই সম্ভব ভেবে বেল টিপলে। বেয়ারা এসে দাঁড়াল। অর্ডার হ'ল পলমল সিগারেটের। সিগারেট আসতে দেরী হ'ল না। বেশ পাকা সিগারেট খোরের মত সিগারেটে একটা টান দিয়ে মহিলাটি বল্লেন, বেশ, এইবার আমায় ওষুধ দিন। আর আপনার বিল হ'বে সেই শেষে—আমার দাঁত ভাল হয়ে গেলে।

ভবতোষ আনন্দে বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার আর কি হয়েছে। সে হ'লেই হ'ল—এই বলে সে একটা মাজন এগিয়ে দিলে মহিলাটির হাতে এবং উপদেশ দিলে ঐটে দিয়ে রোজ দাঁত মাজতে। তারপর ম্যাটিং আর আয়না মহিলাটিকে বার বার করে দেখিয়ে বিদায় দিলে। কথা রইল এক সপ্তাহ পরে আবার আসবার।

দিন আর কাটতে চায় না এক সপ্তাহ আর আসতে চায় না। একদিন এক সপ্তাহ কেটে গেল, মহিলাটিও এসে হাজির হলেন। বল্লেন দাঁতের রোগের কিছুই উপশম হয় নি।

রোগীর মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে ভবতোষ বল্লে একটা ইনজেকসন্ করে দোব তা হ'লেই ভাল হয়ে যাবে। সে তার পাঁচশ' টাকা দামের চেয়ারে মহিলাটিকে বসতে নির্দ্দেশ দিল। আজ নারীর স্পর্শে ডেণ্টাল চেয়ার ধন্য হ'ল। গোটা কতক যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করে ভবতোষ একবার syringএর Needleটা মাড়িতে ঠেকিয়ে বল্লে, ব্যাস, হয়ে গেছে।

নারীর অঙ্গ স্পর্শ করতে ভবতোষের গা শিউরে উঠছিল তাই রেশমী মাথার চুলের ওপর বাঁ হাতের আঙুল ক'টাকে কোন রকমে রেখে তার

কাজটি সেরেছিল। কিন্তু মহিলাটি বল্লেন, দেখুন, আমার সব দাঁত গুলোই একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন। অদূর ভবিষ্যতে যদি কোনটা খারাপ হয় ত' তার এখন থেকে ব্যবস্থা করতে হবে।

আর নরম পাউডার পাফের মত গালে হাত না দিয়ে উপায় নেই! ভবতোষ ইতস্ততঃ করছে—"দেখুন?" মহিলাটি আবার বল্লেন, "কি হ'ল ডাক্তারবাবু, দেখুন, আমি আর কতক্ষণ হাঁ করে থাকব?"

মহিলাটির গালের নরম মাংসের অন্তরালে ভবতোষের বাঁ হাতের পাঁচটি আঙুল অদৃশ্য হয়ে গেল। ভবতোষ সব দাঁত পরীক্ষা করে দেখলে।

দাঁত পরীক্ষার পর মহিলাটি বিদায় নিলেন। রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। ভবতোষ তাড়াতাড়ি সেটা কানে তুলে ধরল। 'কল' এসেছে সেই মেয়েটির বাড়ী থেকে। ইন্‌জেক্‌সনের ফলে নাকি তার গাল ফুলে উঠেছে! সে শয্যাগত।

পাগলের মত ভবতোষ একটা ট্যাক্সি করে ছুটল মহিলাটির বাড়ীর উদ্দেশে। বেশ ছোটর উপরে বাড়ীখানি। সে গিয়ে নামতেই একটি মহিলা তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল উপরের ঘরে। দুধের মত শুভ্র বিছানার উপর শুয়ে আছে সেই মহিলা পেসেণ্টটি আর গালে তার জড়ান এক রাশ ব্যাণ্ডেজ। কি বেশ-ভূষার চাকচিক্য! এই এত যন্ত্রণার মধ্যেও কি অপরূপ রূপ তার, ভেবে ভবতোষ অবাক হল। মহিলাটি তাঁর শিয়রের কাছে বসবার জন্য ভবতোষকে নির্দ্দেশ দিলেন।

ভবতোষ অপরাধীর মত সেখানে গিয়ে বসল। তারপর ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখল—কোথাও কিছু নেই, আর কিছু হবারও ত' কথা নয় কারণ সে ত' ইন্‌জেক্‌সন্ করেনি মাত্র মাড়িতে ঠেকিয়েছিল। একি অদ্ভুত

রহস্য! হঠাৎ সে শুনতে পেল, বাইরের ঘরে নারীকণ্ঠে কারা যেন বলা-বলি করছে, কমলীর কপাল ভাল, এবার ডাক্তারকে পাকড়েছে! তার উপর কাঁচা বয়স, অতিবাহিত। আজ রাত্তিরটা ওকে এখানে রাখতে পারলে আর কি!

ভবতোষ নেহাৎ ছোট ছেলে নয়। সে সব বুঝল, উঠে দাঁড়াল, তারপর ছুটে নীচে নেমে গেল। একবার পিছন ফিরে তাকাল, দেখল যে এক দল মেয়ে ছুটে আসছে তার পিছনে—তারা যেন তাকে গ্রাস করতে চায়!

সে একবারে এসে হাজির হ'ল তার চেম্বারে। 'লেডিজ্ ওয়েটিং রুমের' পর্দা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে দিলে। পার্টিশানটা ভেঙ্গে সরিয়ে দিলে, চেয়ার টেবিল সব ভেঙে চুরমার করতে লাগল। বয় এসে তাকে ধরে ফেল্ল, বাবু তার কি উন্মাদ হ'ল নাকি! সে বল্লে, এ সব কি করচেন বাবু!

কে শোনে কার কথা! ভবতোষ উন্মাদ তখন—নারীর প্রসঙ্গের অস্তিত্ব রাখব না, সব ভেঙ্গে চুরমার করব! সে চীৎকার করে উঠল। করলেও তাই ভবতোষ। তারপর ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে বসে বসে ভাবতে লাগল—হায়রে যৌবন-স্বপ্ন, হায়রে অনেষ্ট লেবার! হায়রে অধম নারীর মোহ! আয়না আর ম্যাটিং।

—:|*|:—

প্রথম অনুরোধ

যদিও আমি সহরের মানুষ, শুধু সহর নয়, সহরের মত সহর কলিকাতা সহরের মানুষ এবং আমার বাহিরের খোলসটা আধুনিক কলিকাতাবাসী কোন যুবকের অপেক্ষা হীন নয় তথাপি আমার ভিতরটা কেমন যেন পল্লীগ্রামের ভাব এবং সংস্কৃতি কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই! যদিও সহরেই আমার জন্ম, সহরের বুকেই আমি আমার পঁচিশটি বৎসর নানা ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া কাটাইয়া দিয়াছি তথাপি সহরের যেন সব কিছু আমার ভাল লাগে না।

সহরের মেয়েদের পুরুষদের হেয় জ্ঞানে উপেক্ষাভরে চাহনি, লোক আকৃষ্ট করিবার জন্য হেলিয়া দুলিয়া খুরের আওয়াজে দিগন্ত কাঁপাইয়া গর্ব্বভরে চলা, সর্ব্বোপরি সুষমাহীন কঙ্কালসার দেহে পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্যে লালসাময় ঔজ্জ্বল্য ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস আমার চোখে বড় বিসদৃশ লাগে।

তাই যখন বিবাহ করিবার মনস্থ করিলাম তখন মনে মনে ভাবিলাম, একটি গ্রাম্য লজ্জাবনতা বালিকা বধূ যার কাছে তার স্বভাব সুষমাই বড়, যে চাকচিক্য জানে না, যে প্রকৃতির দুহিতা, যে স্বামীর সঙ্গে নিজেকে নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া একেবারে মিশাইয়া দেয়, যে স্বামীর

সহিত তর্ক করে না, যে সেবা যত্নের দ্বারা তাহার ভালবাসা পাইতে ইচ্ছা করে; এই রকম একটী বালিকাকেই জীবনসঙ্গিনী করা ভাল।

ক্ষণপরেই আবার মনে হয়—পল্লী বালিকা নিজের কোন অস্তিত্ব রাখে না, স্বামীর হাতের খেলার পুতুল হইয়া থাকিয়াই সে সুখী হয়, কিন্তু সে ত ভাল হইবে না? যদি মান অভিমানের পালাই না চলিল, যদি সময় সময় একটু কলহই না হইল, তবে কি করিয়া দাম্পত্য জীবনটা সম্পূর্ণ উপভোগ করা যাইবে?

এই সব নানা কথা ভাবিয়া যখন আর ভাবিবার ক্ষমতা রহিল না তখন অসাড় মন এক পল্লী বালিকাকেই বধূরূপে ঘরে আনিবার জন্য সায় দিল।

একদিন অনিন্দ্য সুন্দর ছোট্ট একটি ফুটফুটে যুবতী তাহার লজ্জাবনত আনন লইয়া আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, বড় ভাল লাগিল তাহার সেদিনের সেই মূর্ত্তি, মনে মনে আশা জাগিল—এই ক্ষুদ্র যুবতীই একদিন আমার জীবনের ধ্রুবতারা হইয়া আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে।

ফুলশয্যার রাত্রে, বেঙ যেমন সাপ দেখিলে ভয়ে এক কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া কাঁপিতে থাকে তেমনি সেদিনও সে বিছানার এক কোণে জড়সড় হইয়া শুইয়া কাঁপিয়াছিল। কিসের যে ভয় তা সেই জানে! পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে, ভয় নয়, সেটা লজ্জা। ভয়ে লোকে মরে সেদিন সে লজ্জায় মরিয়া গিয়াছিল। কত করিয়া সেদিন তাহাকে কথা কহাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু পারি নাই।

ফুলশয্যার পর সে বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। এক মাস পরে যখন সে আবার প্রথম তাহার স্বামীর ঘর করিতে আসিল তখন ভাবিয়াছিলাম—আজ তাহাকে কথা কহাইতেই হইবে। উপায় খুঁজিতে লাগিলাম, একটু চেষ্টার পরই উপায়ও আবিষ্কার হইয়া গেল। জানি, এই সরলমনা বধূগুলি স্বামীর জীবনকে নিজের জীবনের চেয়েও বড় জ্ঞান করে তাই তাহাকে আঁকড়াইয়া থাকে; যমের কবল হইতে ফিরাইয়া আনিতে চায়; স্বামীর একটু অসুস্থতার কথা শুনিলে মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়ে।

অসুস্থতার ভাণ করিয়া তাই শুইয়া রহিলাম। রাত্রি দশটার পর যখন সে শুইতে আসিল তখন অসুস্থতার ভাণপূর্ণ অস্ফুট আওয়াজ আমার মুখ হইতে আপনাআপনি বাহির হইয়া আসিল। এমি ভাব, যেন কত কষ্টই না হইতেছে। দেখি, সেদিন সে আর আলো নিভাইয়া চুপ করিয়া অপর দিকে ফিরিয়া শুইয়া পড়িল না; সে আমার দিকে আগাইয়া আসিল। ঘোমটার ভিতর দিয়া তাহার মুখ দেখিতে পাইতেছিলাম—দেখিলাম, বড় সুন্দর আর করুণামাখা সে মুখ! সে আস্তে আস্তে আমার শিয়রে আসিয়া বসিল, লজ্জা তাহার কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সে আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে করুণভাবে বলিল, বড্ড কষ্ট হচ্ছে?

রোগের ঔষধ ধরিয়াছে ভাবিয়া মনে মনে বড় হাসি আসিল, হাসি অতি কষ্টে দমন করিয়া ছোট্ট কথায় উত্তর দিলাম, হুঁ।

আমার কথায় মালতী আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িল, বলিল, ডাক্তার দেখাননি কেন? এইবার বদ্ধ হাসি উছলাইয়া পড়িল, হাসিতে হাসিতে

বলিলাম, ডাক্তার! ডাক্তার কেন? সামান্য মাথা ধরা বইত নয়? তা তুমি এত বড় ডাক্তার আর তোমার এই অমোঘ ওষুধ থাকতে, বলিয়া তাহার সাদা নরম হাতটি বুকের উপর তুলিয়া লইলাম।

লজ্জায় সে মাটির সহিত মিশাইয়া যাইতেছিল, বলিল, কি যে বলেন। কথা কহাইয়াছি, মনের আশা মিটিয়াছে ভাবিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, এখন যে দেখছি বেশ মুখ ফুটেছে? আগে মনে করেছিলুম, একটা বোবাকেই বুঝি বা বিয়ে করলুম।

মালতী আধ আধ সুরে আমার হাতের মধ্যে হাত রাখিয়াই মাথাটি একটু লজ্জায় নোওয়াইয়া উত্তর দিল, তা বলবেন বই কি! আপনাদের কি? তখন যা লজ্জা লাগে। একজন অজানা পুরুষের সঙ্গে কথা কওয়া...।

আমি বুঝি অজানা, পর হ'লুম?

ঠিক তন্ত্রীতে ঘা লাগিল। সে অপরাধীর মত বলিল, না, তাই বুঝি আমি বলছি? আপনি ত এখন সব চেয়ে আপনার। তাইতে ত আজকে এত কথা কইছি, দেখুন না, একটুও বাধছে না। আজ সারা রাত আপনার সঙ্গে বসে বসে গল্প করব।

—যাক্, তাহ'লে আজ আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, বোবা মানুষে সারা রাত কথা কইবে এটা একটা নতুন জিনিষ বটে।

—বেশ, আমায় বোবা বোবা করছেন ত? দেখবেন ভগবান আমার স্বামীর ইচ্ছেই পূর্ণ করবেন। দেখবেন তখন যেন আপনার কিছু কষ্ট হয় না।

তাহার কথায় মনে বড় আঘাত লাগিল। তাহাকে সোহাগ

করিয়া বলিলাম, ও আমার হরবোলা রে, তুমি কোন দুঃখে বোবা হয়ে যাবে?

তাহার পর তাহাকে জোর করিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিলাম। তাহার পর আমাদের গল্প সুরু হইল। তাহাকে বলিলাম দেখ, ক'দিন ধরেই মনটা আর শরীরটা ভাল নয়, চল না দু'দিন ঘুরে আসি কোথাও। আমার দেশ বিদেশে বেড়াতে বড় ভাল লাগে। এতদিন সঙ্গীবিহীন ভবঘুরে ছিলাম যাহ'ক ভগবান যখন একটা সঙ্গী করে দিলেন তখন ত আরও ভালই হ'ল। চলনা ক'দিন আগ্রা, দিল্লী ঘুরে আসি। তোমার দেশ ভ্রমণ ভাল লাগে না?

—খুব ভাল লাগে! কোথায়ই বা গেছি ছাই! তোমার দৌলতে যদি কিছু এইবার হয়! তা আগ্রা, দিল্লী গিয়ে কি হবে? সেখানে যত সব কব্বর। চল না একবার "গঙ্গা-সাগর" বেড়িয়ে আসি।

"গঙ্গা-সাগর"! মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। কোথায় যাইবে বিরহীর মর্ম্মবেদনা ভরা প্রীতি শ্বেত মর্ম্মর দিয়া গাঁথা পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের এক আশ্চর্য্য তাজ, পাপীর প্রায়শ্চিত্তে ভরা যমুনা ব্রজ দেখিতে তা নয় কিনা "গঙ্গসাগর"! এই বেরসিকতার জন্যই ত ভাল লাগে না এই সব মেয়েগুলোকে। মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিলাম। ভাবিলাম—স্ত্রীর 'প্রথম অনুরোধ' রাখিতেই হইবে। বলিলাম, বেশ তাইতেই যদি তুমি আনন্দ পাও ত তাই হ'বে।

মালতী আনন্দে আটখানা হইয়া বলে, তা আনন্দ পাব না, সাত জন্মের পুণ্যি হয়ে যাবে। তা কবে যাবে গো?—মালতী সোহাগ করিয়া বলে।

—কালই চল না, আমার কোন আপত্তি নেই। সকালে সব ঠিক করে ফেলো। ট্রেণে ডায়মণ্ডহারবার যাব। সেখান থেকে নৌকোয় করে "গঙ্গা-সাগর" যাওয়া যাবে।

পরের দিন সকালেই রওনা হইলাম। বৈচিত্র্যহীন পৃথিবীর মাঠ, ঝোপ, জঙ্গল দেখিতে দেখিতে দুইজনে ট্রেণে করিয়া চলিলাম।

ট্রেণ পূর্ণ গতিতে চলিতে চলিতে হঠাৎ মাঠের মধ্যে এক স্থানে থামিয়া গেল। জানালা দিয়া চাহিয়া বুঝিলাম, 'সগন্যাল দেয় নাই তাই গাড়ী থামিয়াছে, মনে মনে একটু কৌতুহল জাগিল। মালতীকে ভয় দেখাইলে তাহার ব্যাকুল চাহনি আমার বড় ভাল লাগে তাই শশব্যস্তর ভাণ করিয়া অসহায়ের মত বলিয়া উঠিলাম, ঐ সামনে একটা ট্রেণ এসে পড়ল ধাক্কা মারলে বুঝি! আমার কথা শুনিয়াই সে শিশুর মত আসিয়া একেবারে আমার বুকে মুখ লুকাইয়া। গাড়ী শুদ্ধ যাত্রী অবাক হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। একজন রসিক ফটোগ্রাফার অলক্ষ্যে বোধ হয় একটি এই দুর্লভ স্ন্যাপের সদ্ব্যবহার করিল। নিজের নির্বুদ্ধিতায় লজ্জায় নিজেই মুষড়াইয়া পড়িলাম। লজ্জায় তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া চোখের ইসারায় রাগের ভাণ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলাম, যাঃ, গাড়ী শুদ্ধ লোক, একটু জ্ঞান নেই? একে পল্লী গ্রামের ভাতু মেয়ে তায় আবার ট্রেণ দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, আমার কথা সত্যের চেয়েও বেশী মানিয়া লইয়াছে বলিয়া সে লজ্জার মাথা খাইয়া আমাকে আরও জোরে জাপটাইয়া ধরিল। উপায় নাই দেখিয়া মান সম্মান ভুলিয়া তাহাকে কত করিয়া বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলাম আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, এরূপ মজা দেখিবার আশা আর

জীবনে কখনও পোষণ করিব না। এইবার দুইজনে মুখবন্ধ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। হঠাৎ মালতী একটা পাখী দেখাইয়া বলে, ওটা নেজ ঝোলা পাখি না?—

হ্যাঁ, ও গুলোকে বলে পুলিশ পাখি। কোথাও আগুণ লাগলে ওরা আগে গিয়ে সব পাখিকে সাবধান করে দেয় আর ওদের বড় বড় চিল ও ভয় করে—আমি গম্ভীর ভাবে বিজ্ঞের মত বলিয়া চলি।

মালতী বিশ্বাস করিতে পারে না, বলে, হ্যাঁ, তাই বুঝি আবার হয়? পাখির আবার পুলিশ থাকে নাকি?

এম্নি করিয়া ট্রেণ ডায়মণ্ডহারবারে আসিয়া পৌঁছিল। দিগন্ত বিস্তৃত গঙ্গা। তাহার বুকে অগণিত ষ্টীমার, নৌকা দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতেছে। আমরা দুজনে গঙ্গার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আজ মালতী সব লজ্জা ভুলিয়া কলিকাতার আধুনিকার মতই আমার হাত ধরিয়া গঙ্গার ধারে দাঁড়াইয়া তন্ময় হইয়া গঙ্গার ঢেউ গুণিতে লাগিল। আমাদের দেখিয়া কত মাঝি ছুটিয়া আসিল। একটা মাঝিকে এক পাশে ডাকিয়া আনিয়া নিভৃতে সব বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলাম।

ষ্টীমার ছাড়া নৌকায় মালতী যাইতে কোন রকমে রাজি নয়। জোর করিয়া তাহাকে নৌকায় উঠাইয়া লইলাম। মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। দেখিলাম—মালতীর চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, সে কাঁদ কাঁদ সুরে বলিল, বড় ভয় করছে আমার, সেবার কি হয়েছিল জান? এম্নি নৌকায় করে গোলাপ আর তার স্বামী যাচ্ছিল গঙ্গাসাগর, এমন ঝড় উঠল যে, তাদের আর ফিরতে হ'ল না, বলিয়া মালতী কাঁদিয়া ফেলিল।

একবার একটী মাঝি আমাদের দিকে ঈষৎ তাকাইয়া ভাবিল, বুঝি বা নব বধূকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

মালতীকে পাশে বসাইয়া তাহার গলায় হাত দিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আদরের সুরে বলিলাম, তাতে কি হয়েছে। সেত ভালই। এম্নি করে আমরা দু'জনে জড়াজড়ি করে মরব। গঙ্গায় ভেসে ভেসে আমাদের মৃতদেহ কোথায় গিয়ে ভিড়বে কে জানে। যদি জঙ্গলের দেশ হয়, জগত কিচ্ছুই জানবে না। আর যদি সহর হয় তবে কত লোক আসবে আমাদের দেখতে। তারা দেখবে, কেমন আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হয়ে আমরা চির নিদ্রায় অভিভূত। যারা অবিবাহিত তারা আমাদের ভালবাসা দেখে অবাক হয়ে যাবে। যারা বিবাহিত তারা কটুক্তি করে বলবে, প্রেম করে মরেছে নিশ্চয়। হঠাৎ তাদের চোখে পড়বে তোমার সিঁথির রক্তের মত লাল টক্ টকে সিঁন্দুর আর তারা শিউরে উঠবে, মৌন হয়ে ফিরে যাবে। এঃ, কি বল, কেমন হ'বে, ভাল হ'বে না?

মালতী একটু কথায় উত্তর দেয়, হুঁ।

—তবে আর ভয় কিসের?

মালতীর আর ভয় লাগে না। সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। বড় বড় ঢেউ নৌকার গায়ে লাগিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। এখন আর সে মৃতুকে ভয় করে না, এম্নিভাবে দু'জনে পাশাপাশি বসিয়া মরিলেই যেন সব চাইতে আনন্দ পায় তাই আনন্দে সে তাহার লাল আল্‌তা পরা পা দুইটি-জলে ডুবাইয়া দিল। লাল আল্‌তা ধুইয়া গঙ্গার নীল জল লাল হইয়া গেল। তাহাকে বলিলাম, পা তুলে বস, কত কুমীর হাঙ্গর আছে, কখন কি হয় বলা যায়?

সে একবার আড় চোখে আমার দিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া দুষ্টু মেয়ের মত আরও জোর করিয়া পা দুটি জলে দুলাইতে লাগিল। দেখিলাম, কথায় হইবে না। তাহার কোথায় আঘাত করিলে সদ্য ফল ফলিবে তাহা এই দুই দিনেই বুঝিয়া লইয়াছি, তাই আমিও জলে পা ডুবাইয়া দিলাম।

দেখি মালতী পা তুলিয়া লইল, বলিল, পা তোল। এই না আমায় বলছিলে?

অবজ্ঞাভরে বলিলাম, আমাতে তোমাতে তফাৎ অনেক। ও লাল আলতা পরা দুধের মত পা দেখলেই কুমীরগুলো ভাববে, বুঝি বা ক্ষীরের তৈরী একটা কিছু—আর এসে অমনি গপ্‌ করে গিলে ফেলবে। আর আমার ভাববে, একটা পোড়া কাঠ, কেন কামড় দিয়ে দাঁত ভাঙতে যায়?

—যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না, বলিয়া এক টান দিয়া মালতী আমার পা জল হইতে উঠাইয়া দেয়। হঠাৎ নিকটেই একটা শুশুক ভাসিয়া উঠে।

—ওগো, ঐ বুঝি একটা কুমীর, বলিয়া মালতী আমার গা ঘেঁসিয়া বসে।

—ও কুমীর না, শুশুক।

—শুশুক কিগো? ও বোধ হয় জলের শুয়োর! ঠিক শুয়োরের মত ঘোঁৎ করে জলের উপরে লাফিয়ে উঠে আবার ডুবে গেল।

—বেশ তাই শুয়োর ত শুয়োর। দেখো যেন আবার তাড়া না করে।

জলের তালের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা উঠিতেছে, নামিতেছে। দূরে গাং চিল গুলি ঢেউ-এর সঙ্গে যেন নাচিয়া বেড়াইতেছে। এক একবার দলবদ্ধ হইয়া উড়িতেছে আবার বসিতেছে। হয়ত বা কোথাও একটার পিছনে আর একটা তাড়া করিতেছে, ভয়ে সে পলাইয়া যাইতেছে। এম্নি করিয়া তাহারা খেলা করিতেছে। মাঝিরা গান ধরিয়াছে। নৌকা চলিয়াছে আপন মনে। এইরূপে চারি ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

হঠাৎ মৌনতা ভঙ্গ করিয়া মালতী জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁগো, গঙ্গাটা যেন ছোট হয়ে আসছে মনে হচ্ছে, কেন বলত? পথ ভুল হয় নি ত? সেবার খান্ত পিশির কাছে শুনেছিলুম, সাগরের কাছে গঙ্গার নাকি এপার ওপার দেখা যায় না।

—যেমন তোমার খান্ত পিশি, হ্যাঁ! সাগরের কাছে বুঝি গঙ্গা বড় হয়? সেটা ত মোহানা, গঙ্গা, সেখানে ছোট হ'বে!

আমার কথাতেই মালতী বিশ্বাস করে। সে আবার বলে, আচ্ছা, ঐ দূরে ধারে ধারে সব কলের চিমনীর মত, পাকা বাড়ীর মত, কি সব দেখা যাচ্ছে গো?

হ্যাঁ, তাও জান না? গঙ্গাসাগরের কাছে ত সুন্দর বন। এটা সুন্দর বনের একঅংশ আজকাল ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কৃপায় সে সুন্দর বন আর নেই। এখন কত চাষ হচ্ছে সেখানে, কত কল কারখানা বসেছে। ও সব সেই কলকারখানা।

বিশ্বাস করা ছাড়া মালতীর উপায় নাই। একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে হাসিলাম, দেখিলাম সে যেন ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। কি যেন চিন্তায় তাহার মন ভারাক্রান্ত।

ক্রমে ক্রমে নৌকা আরও আগাইয়া আসে। এইবার মালতীর বুঝিতে আর বাকী থাকে না, সে দূরে একটা পোল দেখাইয়া বলে ওটা নিশ্চয় হাবড়ার পোল, কত লোক যাচ্ছে! তুমি নিশ্চয় মিথ্যে করে বলেছ 'গঙ্গাসাগর' নিয়ে যাচ্ছি।

অভিমানে তাহার মুখ ফুলিয়া উঠিল. চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা বড় বড় অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাহার মনের অবস্থা দেখিয়া প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। সে যে এতখানি আঘাত পাইবে তাহা আমি ভাবিতেও পারি নাই। তাহার হাতে হাত রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, অন্যায় হইয়াছে, আসছে বছর তাহাকে নিশ্চয় 'গঙ্গাসাগর' লইয়া যাইব।

এইবার নৌকা ঘাটে ভিড়িল। মালতী ব্যথা, অভিমান সব ভুলিয়া গেল, ঠাট্টা করিয়া আমাকে তাহার বাঁ হাত দিয়া মৃদু এক ধাক্কা দিয়া তীরে নামিয়া পড়িয়া লজ্জাজড়িত মুচকি হাসি হাসিয়া বলিল, তাই বুঝি মাঝিকে আড়ালে ডেকে তার সঙ্গে অতক্ষণ ধরে যুক্তি করা হচ্ছিল? যাও আর যদি কখনও তোমার সঙ্গে কোথাও যাবার নাম করি।

দরদী

শরৎকাল। আর দু'একদিন বাদেই পূজো। ভোর বেলায় বদনের ঘুম ভাঙতেই জানলাটা সে খুলে দিয়ে উঠে বসল। পথ পরিষ্কার পেয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস অম্নি তার মুখে এসে পড়ল। তখনও আঁধার অপসৃত হয়নি। সে কোঁচার খুঁটটা খুলে গায়ে দিল—দিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগল; সারা পৃথিবীটা কেমন যেন ঝিমিয়ে গেছে, মনে কিন্তু তার আনন্দের উত্তাল তরঙ্গ বয়েই চলেছে। পূজো কথাটা ভেবেই তার যেন কি একটা মনের মধ্যে গুম'রে গুমরে উঠতে লাগল। সেই পূজো বাড়ীতে নূতন সাজে ছেলে মেয়েদের আনাগোনা, ভিখারী দলের অবোধ্য কলরোল, ধূপ ধূনার গন্ধে মাতোয়ারা ঠাকুরদালান, পুরোহিতের মধুর কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ, সেই বিজয়ার দিনে সকলের কোলাকুলি একে একে সবই তার মনে আসতে লাগল।

হঠাৎ বাবুর ডাকে তার চমক ভাঙল। সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাবু হেসে বল্লেন, কিরে বদন! পূজোর বাজারেও তোর এত ঘুম! এই নে, এই চারটে টাকা, তোকে পূজোর বকশিস দিলুম।

বিহ্বল নেত্রে বদন হাত পেতে ফেলে—সে বুঝতে পারে না, এ আবার কি হ'ল। আজ কয় বছরই হ'ল সে ত এখানে আছে। কোনবারে পূজোয় একটা কাপড় জামা মেলে না,এ আবার কি ব্যাপার! সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে, মনে করে, এবার বুঝি ভাগ্যদেবী তার প্রতি প্রসন্না হ'লেন। সেই ত যখন তার দু' বছর বয়স তখন তার বাপ মা মারা যায়। তার ছোট বোন ও সে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে কিছুদিন ছিল তার পর ত বোনটা আসানসোলে ঝি-গিরী করতে গেছে আর তাকে ত এখানে চাকরগিরী করতে হচ্ছে। আজ এখানে দু' বছর কেটে গেছে, কিন্তু কই এত দয়া ত বাবুর কখনও হয়নি!

নগদ চারটে টাকা সে নিজের বলে কখনও হাতে পায়নি তার উপরে এই পূজোর বাজারে চার টাকা পেয়ে সে যে ঐ টাকা দিয়ে কি করবে তাই ভেবে সারা। টাকা চারটে খুঁটে বেঁধে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কত নূতন সাজে কত ছেলেমেয়েকে সে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলে। দোকানে কত রং বেরং এর কাপড়জামা সাজান দেখল—দেখে ঠিক করে নিল কোনটা তাকে খুব মানাবে, কোনটা সে কিনবে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে আপন মনে রং ফলাচ্চে এমন সময় তার এক বন্ধু এসে কাঁধে একটা ঠেলা দিয়ে বল্লে, কিরে বদন! রাস্তায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে কি দেখছিস্? বেল পাকলে কাকের কি? চোখে দেখে মন খারাপ করে কি লাভ ভাই!.চ তোর আজ সকালে কিছু কাজ নেই?

বন্ধুর সম্ভাষণে বদন চমকে উঠে বলে, কাজ আছে বৈকি। আজ ভাই আমার একটু কপাল ফিরেছে তাই এলাম একটু এ সব দেখতে। তুমি কোথায় যাবে ভাই সকাল বেলা?

বন্ধু একটু উদাস হয়ে চোখ ঘুরিয়ে বলে, আর কোথা ভাই। এই বাবুর ছেলেদের খাবার আনতে যাচ্ছি। তা হঠাৎ তোমার ভাগ্যের কি পরিবর্ত্তন হ'ল ভাই ?

বদন কাপড়ের খুঁটের একটু খুলে টাকা চারটে দেখায়।

সত্যিই ভাই তুমি ভাগ্যবান, চারটে টাকা বকশিস্ পেয়েছ ? তবে ভাই পূজোর বাজারে বন্ধুকে কিছু খাইয়ে দাও, বলে বন্ধু বদনের হাতের আঙ্গুল ধরে টান দেয়।

বদন বন্ধুর সঙ্গে যেতে যেতে বলে, তা তোমায় ভাই কিছু দেয়নি ? কি মনিব তোমার ?

কচুরী, সিঙ্গাড়া ও মিষ্টি, এই চার আনার এক ঠোঙ্গা কিনে বদন বন্ধুর হাতে তুলে দেয়। সে একা খেতে চায়না তাই অগত্যা তাকেও এক ঠোঙ্গা কিনতে হয়, কিন্তু তার আর খাওয়া হয় না। একটা ভিখিরী এসে হাত পাততেই সে নিজের হাতের ঠোঙ্গা বাড়িয়ে দেয় ভিখিরীকে। ভিখিরী প্রথমটা মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকে তারপর হয়ত পূজোর বাজারে এ সম্ভব ভেবে ঠোঙ্গাটা নিয়ে শত ধন্যবাদ দিতে দিতে খেতে খেতে আপন মনে চলে যায়। তারপর দোকানদারকে আট আনা পয়সা দিয়ে বদন বাড়ী ফেরে।

বাড়ী ফিরতেই গৃহকর্ত্রী রেগে বলেন, 'কিরে বদন! কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? পূজোর বাজার বলে কাজ টাজ করতে হ'বে না, না কি ভেবেছিস্ ?

কোন কথার উত্তর না দিয়ে বদন আপন কাজে লেগে যায় কিন্তু আজ কাজে কিছুতেই মন বসে না, কি একটা আনন্দে তার মনটা

সর্ব্বদাই চঞ্চল! বেলা তখন বারটা হ'বে, সবাই খেতে বসেছে। খেলে বাসন মাজতে হ'বে। উপস্থিত হাতে কোন কাজ নেই তাই বদন আপন মনে আবার ভাবতে লাগল—চার চারটে টাকা। এত টাকা দিয়ে কত জিনিষ সে কিনবে। আবার ভাবলে, না সব টাকা খরচ করলে হবে না, কিছু জমিয়ে রাখতে হ'বে। হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল সুদূর-প্রবাসী তার বোনের শুষ্ক মুখটি—মনে পড়ল তার কথা, 'দাদা এতদিন কাজ করলে কত টাকা জমালে, কিন্তু আমাকে একবার ত পূজোয় একটা কাপড় দিলে না। আসছে বছর আমার একটা ভাল কাপড় চা-ই'। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। বড় রাস্তার ধারে একটা কাপড়ের দোকানে এসে হাজারখানা উল্টে পাল্টে দেখল, কোন রংটা তার বোনকে মানাবে। কোন রংটা সে পছন্দ করে। শেষে বাসন্তী রং তার ফর্সা রংএর সঙ্গে বেশ মানাবে ভেবে দু'টাকা দিয়ে একটা বাসন্তী রংএর কাপড় কিনে নিয়ে লুকিয়ে ঘরে ঢুকবে এমন সময় দোরের সামনেই স্বয়ং গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে দেখা। তিনি তাকে দেখেই বল্লেন, 'কিরে, কোথায় ছিলি? পূজো পূজো করে কি পাগল হয়ে গেলি নাকি? ও আবার হাতে ওটা কিরে, দেখি? এ এমন ভাল শাড়ী কার রে?'

গৃহকর্ত্রী কি মনে করবেন এই ভেবে উত্তর দিতে বদনের কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। চোখ বুজে সে বলে ফেলে, 'আমার বোনের। অনেক দিন থেকে চেয়েছিল, বাবুরা ত দেয় না।

গৃহকর্ত্রী রেগে বল্লেন, তা এই কম দামী কাপড়টি ঝি বোনের উপযুক্তই বটে! চারটে টাকা দেওয়া হয়েছে বলে ধরাকে সরা দেখেছেন।

কোথায় অসময়ের জন্য জমিয়ে রাখবে না নবাবী, সাধে বলে গরীব লোকের মরণ।

চোখের জল চোখে মুছেই কাপড়টা নিজের ভাঙ্গা পোর্টম্যানের উপর ফেলে দিয়ে বদন আবার আপন কাজে লেগে যায়। কাজ শেষ করে খাওয়া দাওয়া হ'লে সে একবার সহরটা বেড়াবার ইচ্ছে করে, কারণ তার হাতে এখনও দেড়টা টাকা আছে, সহর বেড়াবার সে সম্পুর্ণ উপযুক্ত। সব খরচা করা হ'বে না, এই ভেবে সে তার ভাঙ্গা পোর্ট-ম্যানটায় আট আনা রেখে বাকি একটা টাকা কাপড়ের খুঁটে বেঁধে বেরিয়ে পড়ে!

গাড়ী ঘোড়ায় রাস্তা একাকার। আজ এ সব সে এক নূতন চোখে অনেকক্ষণ তন্ন তন্ন করে দেখে কারণ আজ সে টাকার অধিকারী, সে এ সব যত ইচ্ছা উপভোগ করতে পারে। আগে মনে করত, এ সব গাড়ী ঘোড়ার ঘড় ঘড়ানিতে মানুষের পৃথিবীতে টেঁকা দায় হয়েছে, এখন ভাবে, বারে ও গাড়ীটাত বেশ, ও গাড়ীর ঘোড়াটা খুব তাজালো কেমন জোরে গাড়ীটা টানছে, ঐটেতে চড়ে সে একবার সহরটা ঘুরে আসবে; আবার ভাবে, না পায়ে হেঁটে আজ সহরটা সে আগে একবার দেখে নেবে তার পর যা হয় করবে। অজানা পথে ঘুরতে ঘুরতে সে গঙ্গার ধারে এসে পড়ে! জাহাজের ঘাটে সব লোকের ভিড় লেগে গেছে। সবাই পূজোর বাজার করে বাড়ী ফেরবার জন্যে ব্যস্ত। কত লোক কত রং বেরং এর জামা কাপড়, জিনিষ পত্র কিনে কুলির মাথায় দিয়ে জাহাজ ধরবার জন্য ছুটোছুটি করছে! আর কত লোক বেড়াতে এসে সেই সব দেখে কতই না আনন্দ উপভোগ করচে! গঙ্গার স্রোত তালে তালে

ঢেউ তুলে অবিরত বয়ে চলেছে। সাদা সাদা গাংচিলগুলো জলের উপর থেকে যেন এক চুমুক করে জল খেয়েই আবার উড়ে পড়ে। দূরে সূর্য্যদেবের প্রায় অর্দ্ধশরীর গঙ্গা বক্ষে নিমগ্ন, আর তা দেখে মনে হয়, যেন শরৎ সন্ধ্যার ঠাণ্ডা জল তাঁর শরীরে লাগায় তিনি থর্‌থর্ করে কাঁপচেন। ছোট, ছোট, নৌকার মাঝিরা আপন মনে যাত্রী নিয়ে গঙ্গায় তাদের ছোট ছোট নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে গান করতে করতে চলেছে। কত স্কুল, কলেজের ছেলেরা দল বেঁধে নৌকা ভাড়া করে বাঁশীর সুরে দিগন্ত মাতোয়ারা করে তুলেছে। এ সব দেখে তার মনটাও কেমন আনন্দে দুলতে লাগল। মনে হ'ল—সত্যিই পূজো কি জিনিস, সব জিনিষেই আপনা থেকে কেমন একটা নূতন জীবন এসে পড়ে। সারা জীবন, সারা বছর যার মুখে হাসি দেখা যায় না পূজোর সময় সেও কদিন ধরে হেসে খেলে জীবনটাকে উপভোগ করে। নানা চিন্তা তার মনে আসতেই সে ঘাটের ধারে এক জায়গায় বসে পড়ে। এমন সময় একটা লোকও তার পাশে এসে বসে। লোকটা বেশ একটু ভদ্দর গোছের, বলে, কিহে ছোকরা! ঠাণ্ডায় গঙ্গার ধারে জলো হাওয়ায় খালি গায় বসতে আছে? কাপড়ের খুঁটটা খুলে গায়ে দাও না! বদনও ভাবে, তাইত! একবার টাকাটা কাপড়ের খুঁটে আছে কিনা দেখে সে বেশ করে মেয়েছেলেদের মতন কাপড়ের এক অংশ গায়ে চাপিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে সন্ধ্যে হয়ে আসে। যে যার বাড়ী ফিরে যায়। গঙ্গাবক্ষে জাহাজের আলোগুলো জোনাকী পোকার মত যাতায়াত করতে থাকে। পাশের ভদ্দরলোকটিও কখন উঠে চলে গেছেন। বদনও কিছু পূজোর বাজার করে বাড়ী ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তখন সারা রাস্তা

আলোয় আলো। লোকের ভিড়ে রাস্তা চলা দায়। পাশে পাশে মটরের যেন গাঁদা লেগে গেছে। মটর থেকে কত মেয়েছেলে কত বড় বড় দোকানের সামনে এসে নামছে আর তাদের মনের মত জিনিষ কিনে বাড়ী ফিরছে। বদনও এ দোকান থেকে ও দোকান করে তার মনমত জিনিষ পছন্দ করতে লাগল। হঠাৎ পথে তাদের বাড়ীর পাশের ঝিএর ছোট মেয়ে রাণীর সঙ্গে দেখা। সে হেঁট হয়ে রাস্তার ধারে কি খুঁজছে। বদন তাকে ডেকে বল্লে, কিরে রাণী! কি খুঁজছিস? বদনকে দেখে রাণী ডুকরে কেঁদে বলে, বদনদা, আট আনা পয়সা বকশিস পেয়েছিলুম তাই নিয়ে এসেছিলুম কিছু কিনতে। এখানে দাঁড়িয়ে দোকানের সব জিনিষ দেখছি এমন সময় একটা লোক আমায় ধাক্কা মারলে, আমার হাত থেকে অনিটা পড়ে গেল। আর খুঁজে পাচ্ছি না।

পূজোর দিনে এত আনন্দের মাঝখানে, এত হাসিভরা মুখের মাঝে গরীব বালিকার শুষ্ক মুখ দেখে বদনের প্রাণটা দয়ায় ভরে ওঠে সে কাপড়ের খুঁটের সন্ধানে হাত বাড়ায়, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই একটা বিপদের ছায়া তার মুখে এসে পড়ে। সে দেখে কাপড়ের খুঁট কাটা, সে আর কিছু বলতে পারে না। রোরুদ্যমানা অনুসন্ধানরতা ছোট্ট বালিকার কথা তখন আর তার মনে থাকে না। সে আস্তে আস্তে পিছন ফিরে ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফেরে; ভাবে সরকার কত লোককে কত রকমেত সাজা দেয়। সেদিন ও ত একটা লোকের ফাঁসি হয়ে গেল সে বাবুর মুখে শুনেছে। আর সহরে যে এত বড় বড় ছদ্মবেশী পাকা ডাকাত ঘুরে বেড়াচ্ছে, যারা গরীব ধনী নির্ব্বিচারে সকলের অহরহ পথে ঘাটে সর্ব্বনাশ করে বেড়াচ্চে তাদের কি কোন

শাস্তি নেই! তাদের সব যদি ধরে জেলে পোরে তবেই উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়। এই সব ভাবতে ভাবতে বাড়ীর কাছে এসে আবার সেই ক্রন্দনরতা বালিকার শুষ্ক মুখটি মনে পড়ে। আট আনা নগদ যে তার এখন ও আছে এতক্ষণ তার মনে পড়েনি। এখন মনে পড়তেই সে তার সযত্নে ভাঙ্গা পোর্টম্যানের ভিতর তুলে রাখা আধুলিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাণীর উদ্দেশে। তখন ও দেখে রাণী তার আধুলির আশা ছাড়েনি। পা দিয়ে এটা ওটা নেড়ে রাস্তা তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে, পথের কিন্তু একটা লোকও এই বালিকার দিকে একবার ও চেয়ে দেখছে না। বদন রাণীকে সম্ভাষণ করে বলে, কিরে রাণী! এখনও তুই খুঁজছিস?

রাণী বদনের কাপড়ের খুঁটটা ধরে বলে, বদনদা, একবার খুঁজে দেখনা, তুমি যদি পাও।

বদন উদাস হয়ে বলে, আয় আর খুঁজতে হ'বে না। কি জিনিষ আট আনা দিয়ে কিনবি?

রাণী দেখিয়ে দেয় একটা মস্ত বড় কাঁচ কড়ার পুতুল। বদন আট আনা দিয়ে তাই কিনে রাণীর হাতে দেয়। রাণী সেটাকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে লাফাতে লাফাতে চলে যায়। বদন ও রিক্তহস্তে বাড়ী ফিরে আসে। এম্নি করেই তার পূজোর বক্‌শিস্ সব শেষ হয়ে যায়। তার নিজের আর কিছু কেনা হয় না। যদিও সে গরীব তবু ও মন তার উঁচু। এম্নি করেই দুঃখী দুঃখীর দরদ বোঝে; এম্নি করে অনেকে জানে কেমন করে নিজেকে রিক্তকরে পরকে সাহায্য করা যায়। কেমন করে নিজের একটু সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে পরকে হাসান যায়।

আধুনিক পাগলের ইতিবৃত্ত

বাঙ্গালীর দ্বিতীয় পক্ষের বউ স্বামীকে ঠিক রিভলভিং চেয়াররূপে ব্যবহার করে থাকে। তাকে যেদিকে ঘোরাবে সে ঠিক সেই দিকে ঘুরবে। রিভলভিং চেয়ার বরং মাঝে মাঝে ঘুরতে অসম্মতি জানায়, কিন্তু এর তাও উপায় নেই। তার পর যদি আবার লভ্ ম্যারেজ হয় তাহ'লে যে কি হ'বে তা আমি ক্ষুদ্র লেখক একা বলতে অক্ষম। সহৃদয় পাঠকবর্গ আশা করি সেটা সহজেই অনুমান করে নিতে পারবেন।

আজ বছর দুই হ'ল সুধীর বাবুর সঙ্গে পুষ্পরাণীর বিবাহ হয়েছে। সুধীর বাবু মস্তবড় এক কলেজের খ্যাতনামা প্রফেসর। তাঁর পাণ্ডিত্যে এবং সদয় ব্যবহারে ছাত্রেরা তাঁর প্রশংসায় শতমুখ। সুধীর বাবু যখন কলেজে পড়তেন তখন নাকি তাঁর বাপ মা তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে ধরে বেঁধে এক মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু দু'জনের মধ্যে কেউ কাকেও একদিনের জন্যও ভালবাসতে পারেন নি। তারপর সুধীর বাবুর স্ত্রী মারা যান—এটা তাঁর ভাগ্যের জোরে কি আমার ভাগ্যের জোরে তা বলতে পারচি না কারণ তা না হ'লে আমার গল্পের যবনিকা সেইখানেই পাত হ'ত। সুধীর বাবুর স্ত্রী যে বৎসর মারা গেলেন সেই বৎসরেই দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে এক ছাত্রী সুধীর বাবুর পড়ানর খ্যাতি

শুনে কোন্ এক কলেজ থেকে এসে ভর্ত্তি হ'লেন। পড়াবার সময় কি জানি কেন সুধীর বাবুর দৃষ্টি বার বার তাঁর দিকেই আকৃষ্ট হ'ত। যেদিন কোন কারণ বশতঃ রোল—৯০ না আসতেন সেদিন সুধীর বাবু বার বার রোল ৯০কে ডাকতেন এবং এধার ওধার তাকাতেন; যখন প্রফেসরস্ ওয়েটিং রুমে সুধীর বাবু বসে থাকতেন তখন পুষ্পরাণীকে তাদের হোষ্টেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। প্রথম প্রথম ছ'জনে চোখাচোখি হ'লেই একটু ইতস্ততঃ করতেন তারপর পুষ্পরাণীর চোখ ছ'টি ঠিক শিকারীদের স্পট লাইট হিসাবে ব্যবহার হ'তে লাগল। যখনই সুধীর বাবুর উপর স্পট লাইট পড়ে তখনই তিনি ধাঁ-ধাঁ খেয়ে এক-নেত্রে সেই দিকেই তাকিয়ে থাকেন। এই গেল লভ্ ম্যারেজের প্রাথমিক ইতিহাস।

স্ত্রীকে কে না ভালবাসে। তার উপর দ্বিতীয় পক্ষের লভ্ ম্যারেজ। সে যে কি উৎকট ভালবাসা তা যিনি না দেখেছেন বা না উপভোগ করেছেন তিনি কোন ধারণাই করতে পারবেন না। রোজ বায়োস্কোপ, থিয়েটার, গান বাজনায় মসগুল! এক সঙ্গে প্রেমের ও যৌবনের যেন জোয়ার বয়ে চলেচে, ভাঁটা যেন কখনও পড়বে না! স্ত্রীকে কি করে সুখী করা যায়, কি করলে তার কাছে প্রেম আদায় হয়, এই হয়েচে এখন সুধীর বাবুর একমাত্র সাধনা! তাঁর স্ত্রী শিক্ষিতা, তিনিও শিক্ষিত তাই মনে করলেন—যদি সাধারণের কাছে নাম পাওয়া যায় তা হ'লে বোধ হয় পুষ্প খুব খুসী হয়। এই ভেবে তিনি প্রত্যেক মাসিক পত্রিকাতে লিখতে সুরু করলেন এবং পাব্লিক মিটিং এ যোগ দিতে লাগলেন। তাঁর লেখা দেখে এবং বক্তৃতার কথা শুনে পুষ্পরাণী কি প্রশংসাই না করতে

লাগলেন—বলেন, ওঃ, এ লেখাটা কি সুন্দর হয়েছে, তুমি ছাড়া আর কারও এ রকম লেখবার ক্ষমতা নেই। আজ যে বক্তৃতাটা দিয়েছ তাতে লোক ক্ষেপে গেছে, দেখো রাজদ্রোহের অপরাধী বলে যেন জেলে না ঢোকায়।

*　　*　　*　　*

সেদিন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে একটা খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে দেখা গেল কারণ ২০ মিনিট হয়ে গেছে তবুও প্রফেসর আসেন না। এমন সময় রুক্ষ কেশে সুধীর বাবু এসে হাজির। ক্লাসে ঢুকেই তিনি লেকচার সুরু করলেন, আজ আমি বয়ের কিছু পড়াব না সামান্য কিছু জেনারেল নলেজের কথা ডিসকাস্ করব। আচ্ছা, বলতে পার প্রেম কাকে বলে? আর তার পরিণামই বা কি?

প্রেমের পরিণাম কি তাও বলতে পারলে না? ও, তোমরা পারবে কেন? তোমরা ছেলেমানুষ প্রেম ত করনি। আমি করেচি, এর ফল কি জান—বক্ষে প্রজ্জলিত অগ্নি কুণ্ড, নয়নে শ্রাবণের ধারা, প্রতি মুহূর্ত্ত নিরানন্দে ভরা। না না, আমি কি বলছি, বলে সুধীর বাবু যেমন ভাবে ঢুকেছিলেন ঠিক তেম্নিভাবে পাগলের মত বেরিয়ে গেলেন। তিনি রোল কল করেননি বলে কত ছেলে ঘিরে ধরল, কিন্তু তিনি কারও কথা না শুনে একেবারে সদর রাস্তা পার হয়ে চলে গেলেন। তারপর কলেজ মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল যে সুধীর বাবু পাগল হয়ে গেছেন। প্রিন্সিপ্যালের কানে সব কথা যেতেই তিনি অবাক। এত বড় একটা প্রফেসর সে, ঐ রকম কি করে হ'ল! সন্ধ্যার সময় প্রিন্সিপ্যাল নিজে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সুধীর বাবুর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। কিন্তু

কারও দেখা না পেয়ে ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী ফিরে এলেন। ভাবলেন, সুধীর বাবুই বা কোথায় গেলেন আর তাঁর স্ত্রীই বা কোথায় গেলেন! অথচ ঘর সব খোলা। সত্যি কি সুধীর বাবু পাগল হয়ে গেলেন নাকি! পরের দিন সকালে পুনরায় খোঁজ নেওয়া হ'ল, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন নেই সেই ঘর ফাঁকা—গৃহকর্ত্তা এবং গৃহকর্ত্রী উধাও।

তৃতীয় দিনে প্রিন্সিপ্যালের নিকট এক চিঠি এসে হাজির। তাতে একখানি উইল আর মস্ত এক চিঠি! উইলের মর্ম্ম এই—যদি কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক যে নিজের স্ত্রীকে বা স্বামীকে ছাড়া কখনও কাহারও উপর নজর দেয় নাই বা ভালবাসে নাই, এই রকম যদি কোন লোক পৃথিবীতে থাকে ত সেই আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে নচেৎ আমার যাহা কিছু সমস্তই রাজভুক্ত হইবে আমার ভোগ করিবার আর আসক্তি নাই, থাকিলেও বোধ হয় ভগবান করিতে দিবেন না তাই এই উইল করিয়া রাখিলাম। আমার সুবৃহৎ সম্পত্তির এক তিলেও পুষ্পের কোন অধিকার থাকিবে না।

চিঠিতে লেখা ছিল,—আমি প্রফেসার আমার কথা আপনাকে ছাড়া আর কাকেও বলা চলে না, না বলেও থাকতে পারব না—প্রাণটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, হৃদয়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে তাতে একটু যদি জল না দিই ত জ্বলে পুড়ে মরে যাব তাই আপনাকে এ পত্র লিখে রাখলাম। বোধ হয় যেটুকু সুস্থ চিত্তে আজ এই চিঠি লিখতে আরম্ভ করেচি তাও আর থাকবে না—এই সব ভেবে চিন্তে এত পূর্ব্ব থেকেই এই চিঠি আপনাকে লিখে রাখলাম।

অনেক বই পড়েছি, অনেক শিক্ষা হয়েছে, কিন্তু সে শিক্ষা দেখছি

যদি ঠিক মত কাজে না লাগাতে পারা যায় ত তা-থেকে অনেক বিপদ এসে উপস্থিত হয় এবং আমার বোধ হয় সেটা ঠিক মত কাজে লাগাতে লাখেও একজন পারে কিনা সন্দেহ। স্ত্রী-স্বাধীনতা খুবই ভাল এবং প্রয়োজনীয়, এই শিক্ষাই পেয়েছিলাম আমার বহু কষ্টে অর্জ্জিত জ্ঞানের ফলে। শিখেছিলাম, মেয়েদের যারা ঘরে বন্ধ করে রাখে তারা অজ্ঞ, জ্ঞানের আলোক তাদের ভেতর ঢোকেনি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার সদ্ব্যবহার আমিও করতে পারিনি আর শিক্ষিতা পুষ্প ও না! তবে আমার দোষটা যে অত্যন্ত বেশী তা বলা যায় না। আমি কারও বিবাহিতা স্ত্রীকে ভালবাসিনি যদিও আমার লভ্ ম্যারেজ হয়েছিল। কিন্তু পুষ্প করলে কি! সেটা বলবার আমার ভাষাও নেই আর কলমও চালাবার ক্ষমতা নেই। বিদেশী কোন এক বড় লেখকের খুব একটা নামজাদা বই পড়েছিলুম তাতে এক বন্ধু কেমন করে তার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়েছিল তাই পড়ে অবাক হয়েছিলাম। যে বন্ধুকে সে এত বিশ্বাস করত, এত ভালবাসত, যাকে অভিন্নহৃদয় ভেবে স্ত্রীর সঙ্গে একটা মেলা মেশা করতে স্বাধীনতা দিয়েছিল সেই কিনা এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করল! আমারও ঠিক তাই হয়েছে। সেই ব্যারিষ্টার যাকে একদিন আপনি আমাদের বাড়ীতে দেখেছিলেন। আমি তাকে কত ভালবাসতুম তা আপনি কি জানবেন? বিবাহের পর দিন তার সঙ্গে রাস্তায় দেখা, তাকে তখনই ঘরে এনে আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিই। তার পর সেই পরিচয়ের ফল আস্তে আস্তে কি যে হ'তে চলেচে তা সবই আমি চুপ করে বসে বসে দেখেছি, কিছু বলতে পারিনি কারণ আমি যে একজন প্রফেসর! এইরূপ নীচতাকে আমার

মনে স্থান দেবার অধিকার নেই। আর লিখতে পারি না মাথা গরম হয়ে এসেছে, পাগল না হয়ে যাই। তারপর হয়ত অপরের কণ্ঠ-সংলগ্ন বিষাক্ত হাত এখনি এসে আমার কণ্ঠে বিষ উদ্গার করবে আর আমায় নির্ব্বিঘ্নে মহাদেবের মত তাই পান করতে হবে। ঐ বোধ হয় হর্ণের আওয়াজ হল—এখুনি হয়ত হেসে আমার গায়ে লুটিয়ে পড়ে বলবে, কি লেখা হচ্ছে, আর আমাকেও হয়ত হেসে কথা বলতে হবে, উঃ।

সাহিত্যিকের ঘুম

অসিত ছিল সাহিত্যিক। সাহিত্যিকের চক্ষেই সে সারা পৃথিবীকে দেখিত। কল্পনাই ছিল তাহার সব। বাস্তবতার রূঢ়তা তাহার অন্তরকে একদিনের তরেও স্পর্শ করে নাই। জন্মমৃত্যুর রহস্য, বিবাহ, দাম্পত্য প্রেম ইত্যাদিতে সে বিশ্বাসই করিত না। বন্ধুবান্ধবেরা তাহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে সে বলিত, বিয়েতে আবার কোন প্রকৃত ভালবাসা থাকে নাকি? সেই বিনিয়ে বিনিয়ে রোজ এক মনগড়া কথা, কর্ত্তব্যের খাতিরে যা না করলে নয় তাই করা, নিছক অভিনয়। এ অভিনয় আমার ধাতে পোষাবে না।

একদিন কিন্তু তাহার ভীষ্মের পণ ভাঙ্গিল। সকলে দেখিল— আমাদের সাহিত্যিক অসিতকে আর তাহার বাল্য-সহচরী পাপিয়াকে রাত্রিবেলায় বালিগঞ্জের একটি প্রকাণ্ড বাড়ীর ফ্ল্যাটে স্বামী-স্ত্রী রূপে। তখন বোধ হয় একটা রেকর্ড বাজিতেছিল। পাপিয়ার বড় ভাল লাগিয়াছিল ঐ গায়কের গলার সুর তাই সে তন্ময় হইয়া একমনে গানটি শুনিতেছিল। রেকর্ড শেষ হইতে না হইতেই পাপিয়া উৎসুক হইয়া অসিতকে জিজ্ঞাসা করে, কে গেয়েছে গো?

অসিত রেকর্ডখানি পাপিয়ার চোখের সামনে তুলিয়া ধরে।

পাপিয়া অবাক হইয়া যায়, কি বলিবে ভাবিয়া পায় না। বলে, সত্যি?
—বড় ছোট্ট তাহার কথা।

অসিত মৃদু হাসিয়া উত্তর দেয়, সত্যি নয়ত কি মিথ্যে?

পাপিয়া বড় খুসী হয়, বলে, সত্যি, তুমি গেয়েছ? তুমি এত সুন্দর গাইতে পার? তা এতদিন বলনি কেনগো? এখন থেকে রোজ আমি তোমার গান না শুনে আর ছাড়ছি না।

অসিত পাপিয়াকে গভীর আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বলে, তাই নাকি? আমি তা হলে খুব বড় গাইয়ে হয়ে পড়েছি বল? আর পাপিয়া দেবা, শুধু কি গান! গল্প, উপন্যাস, কবিতা আরও কত কি!

পাপিয়া স্বামীর গুণের কথায় একেবারে গলিয়া যায়।

তুমি আবার গল্প লেখ? তা তোমার একটা গল্প শোনাওনা গো? পাপিয়ার কণ্ঠে আব্দারের সুর।

অসিত দুষ্টুমি করিয়া বলে, গল্প অম্নি শোনা হয় না।

পাপিয়া মৃদু রাগের ভাণ করিয়া ঠোঁটটা একটু কুঞ্চিত করিয়া উত্তর দেয়, অম্নি নয়ত আবার কি? যাও, তবে তোমার গান শুনতে চাই না —এই বলিয়া উঠিয়া যায়।

অসিতও পিছু পিছু উঠিয়া যাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনে। তাহার পর তাহার ঘাড় ধরিয়া দুই হাত দিয়া চাপিয়া তাহাকে চেয়ারে বসাইয়া দিয়া অবজ্ঞার সুরে বলে, বেশ, গ্রাটিশের কাজ, আমিও তেম্নি সারব।

পাপিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া আবার রাগের ভাণ করে, যাও, তবে আমি শুনতে চাইনা।

অসিত এবার আর তাহাকে উঠিতে দেয় না, ধরিয়া বসাইয়া রাখে। তাহার পর জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, প্রেমের গল্প শুনবে, না প্রেমবর্জ্জিত গল্প শুনবে ?

প্রেমের গল্প শুনিয়া শুনিয়া আর ভাল লাগে না। পাপিয়া প্রেমবর্জ্জিত গল্পই শুনিতে চায়।

শেল্ফ্ হইতে একটি বাঁধান মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া অসিত তাহাকে গল্প শুনাইতে থাকে। গল্পের নাম 'পূজার বকশিস'। বিষয়বস্তু —কেমন করিয়া একটি বালকভৃত্য তাহার বন্ধুর, ভগিনীর এবং পরিচিত এক ঝিয়ের ছোট্ট মেয়ে রাণীর মনস্তুষ্টির জন্য তাহার সমস্ত বকশিস্ উজাড় করিয়া পূজার জাঁকজমকপূর্ণ হাস্যময়ী সন্ধ্যায় কপর্দ্দকশূন্য হইয়া আনন্দে বাড়ী ফিরিয়া আসে —যেখানে বালকভৃত্য তাহার শেষ কয় আনা পয়সা কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া সহর বেড়াইয়া ফিরিবার পথে কিছু কিনিয়া বাড়ী ফিরিবে ভাবিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ধারে গিয়া বসে এবং যখন সে তন্ময় হইয়া গঙ্গার দৃশ্য দেখিতেছিল তখন এক ভদ্রবেশী গাঁটকাটা দরিদ্রের সামান্য সম্বল কেমন করিয়া কাটিয়া লয় তাহা শুনিতে শুনিতে পাপিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল এবং ধরা গলায় জোর করিয়া বলিয়াছিল, আচ্ছা, এই যে এত লোকের জেল হচ্ছে, ফাঁসী হচ্ছে আর এই যে দুর্ব্বৃত্তগুলো পথে ঘাটে অলক্ষ্যে ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে অহরহ সর্ব্বনাশ করে বেড়াচ্ছে, তার কি কোন বিচার নেই ? সরকার যদি সবগুলোকে ধরে জেলে পোরে তবেই ঠিক হয়।

তাহার পর গল্প শুনিতে শুনিতে স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়াই পাপিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। মেয়েদের ধৈর্য্যই এই রকম! গল্প আর শেষ হয়না।

অসিতও বই বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেয়। আপনা হইতেই বেড সুইচটায় তাহার হাত পড়ে। আলো নিভিয়া যায়। অসিতেরও কেমন যেন তন্দ্রা আসে।

কয়দিন ধরিয়াই একটা প্লট অসিতের মাথায় দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে। আজ এই রাত্রে যেন তাহাকে বেশী করিয়া পাইয়া বসিল।

রাত্রি তখন বারটা হইবে। অন্ধকার রাত্রি। দিনের কোলাহল কর্ম্মমুখর কলিকাতা যেন একেবারে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আকাশে দুই একটি তারকা জ্বলিতেছে। অসিত তাহার লিখিবার ঘরে প্রবেশ করিল। আজ তাহাকে গল্প শেষ করিতেই হইবে। সরলার জীবনটা কি ব্যর্থ করিয়া দিবে? তাহাকে চিরকালই কাঁদাইবে, না, শেষে তাহাকেই সুখী করিবে? তটিনীকে শেষ পর্য্যন্ত কি করিবে? প্রথমে তাহার জয় হইবে, পরে কি সে পরাজিত হইবে? কি করা যায়? সরলমনা গ্রাম্য বালিকা সরলার দুঃখও ত সারা জীবন দেখা যায় না। অসিত আর ভাবিতে পারে না। কাল কালির দোয়াতের মধ্যে নিবের কাল অংশ ডুবাইয়া দেয়। আলোটা কমাইতেও ভুলে না। তাহার মাথা আপনা হইতেই টেবিলে ঢলিয়া পড়ে। ক্ষণপরেই অর্দ্ধমুক্ত দ্বার দিয়া কে যেন প্রবেশ করে। সাহিত্যিকের চিনিতে বাকি থাকে না এই কি তার সরলা? একটি লজ্জানম্রা, অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা, সরলা গ্রাম্য বালিকা। সে ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘাড়টি নীচু করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে থাকে। বলে, কেন আমায় এমন করলেন? উনি আর একজনকে ভালবাসেন। কি দরকার ছিল তবে আমার এমন

সহুরে শিক্ষিত স্বামীর? স্বামীই যার পর তার আর জগতে কি সুখ? আমার অমন শিক্ষিত স্বামী চাই না। দয়া করে আমায় গাঁয়ের সরল যুবকই দিন।

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে হিলওয়ালা জুতা পায়ে, কাল চশমা চোখে, নভেল নাটক হাতে প্রবেশ করে আধুনিকা একটি যুবতী।

সে রুক্ষ গলায় বলিয়া উঠে, আমায় চেনেন না? আমি তটিনী। তা কেন চিনবেন? আমার ভাগ্যটাই খারাপ। জানেন ওর সঙ্গে আমার কলেজ থেকে আলাপ? অমন একজন স্কলার, আধুনিক যুবককে আমায় না দিয়ে আপনি ওর বিয়ে দিতে চান একটা কুসংস্কারপূর্ণ গেঁয়ো মেয়ের সঙ্গে? যত নোংরা ময়লা কাপড় পরে থাকে, সাত জন্মে সাবান মাখে না। মাগো, গায়ে কি গন্ধ! ওর কাছে ও ত যেতেই ঘৃণায় মরে যাবে। আর ঐ কাল কি কয়লার মত, তাই দিয়ে দাঁত মেজে মেজে আহা দাঁতের কি ছিরিই হয়? আর ঐ মেয়েগুলো কি ভালবাসতে জানে? ওদের বিয়ে করলে ওরা ত ঝি, চাকরাণী বই আর কিছু হতে পারবে না। ওরা কি স্বামীকে আনন্দ দিতে পারে? পারে সুখী করতে? ওরা গান জানে? নভেল, নাটকের সমালোচনা করতে পারে? ওদের ঐ যাকে বলে একেবারে হোপলেস্, বন্য পশু ছাড়া কিছু না। ওর যদি ঐ সরলার সঙ্গে বিয়ে দেন ত বড় অবিচার হবে বলে দিলুম সাহিত্যিক মশাই! ঐ দেখুন অমনি নাকে কাঁদতে সুরু করেছে। তাই বাবু স্পষ্ট বল না তোর কি বলবার আছে, তা নয় অমনি কান্না সুরু করলেন। জানে এর চেয়ে ওদের ত আর বড় অস্ত্র নেই। পেটে বিদ্যে থাকলে তবে ত তর্ক করবে? এই গেঁয়ো মেয়েগুলোকে দেখলে

আমার রাগ ধরে। আবার নাম দেখনা—সরলা! আহা, কি সরলাই, কাঁদলেই অমি সরলা হয় না। যা, যা বেরো!

সরলার কান্নার বেগ আরও বাড়িয়া যায়। সে আগাইয়া আসিয়া সাহিত্যিকের পা দুইটি একেবারে জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে থাকে আর বলে, আমি ছেলে বেলায় শিব পূজো করেছিলুম। সকলে বলত—ভাল স্বামী হবে—তাই। তার কি এই ফল? আমার প্রাণে কত ভালবাসা রয়েছে। আমি তাঁকে কত ভালবাসব; কত যত্ন করব; তাঁর কত সেবা করব। আমি নাচতে গাইতে জানি না, বড় বড় বই পড়তে জানি না; কিন্তু আমি রেঁধে যত্ন করে খাওয়াতে পারি, অসুখে বিসুখে সারারাত জেগে বিছানার পাশে বসে থাকতে পারি, আমি দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হতে পারি। সরলার কথায় বড় মিনতি।

সরলার দুঃখে সাহিত্যিকের চোখে জল আসে, সে দুই হাত দিয়া সরলাকে তুলিয়া ধরিয়া বলে, সত্যি, ঐ তটিনী, ও লেখা পড়া শিখেছে, ও সবটাতেই যুক্তি তর্ক করবে। সবটাই সমালোচকের চোখে দেখবে। ভালবাসাতে কি যুক্তি তর্কের স্থান আছে? তোমার প্রাণেই প্রকৃত সরল ভালবাসা আছে। তুমি যুক্তি তর্ক না করেই নিজেকে সঁপে দিতে পারবে অপরের কাছে। তোমার ভালবাসা পাবারই উপযুক্ত আমার নায়ক। তোমার ভয় নেই, তোমায় আমি আরও ভালবাসা দোব, তোমার ভালবাসা সার্থক করব।

কাহার ধাক্কায় অসিতের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সে চক্ষু মেলিয়া অন্ধকারেই উপলব্ধি করে যে, পাপিয়ার কাছ হইতেই ধাক্কাটা আসিতেছে।

পাপিয়া অভিমানের সুরে বলে, কাকে ভালবাসা দেবে? কার প্রেম সার্থক করবে? কলেজের কোন ছাত্রীকে বুঝি?

অসিত কিছুই বুঝিতে পারে না, বুঝিবার চেষ্টাও করে না। সে পাপিয়াকে কাছে টানিয়া লইয়া বলে, কাকে আবার? এই তোমাকে, তোমার!—সে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে।—আঃ, সরে এস না। অত রাগ কিসের? সরে এস, এস, এস না! কিন্তু পারে না। পাপিয়া আরও রাগিয়া উঠে—যাও বলিয়া সে বাঁ হাত দিয়া অসিতকে ঠেলিয়া দেয়।

—অত যদি ভালবাসা দেবার ইচ্ছে তবে আমায় কেন এমন এতদিন নিখুঁত অভিনয় করে বিয়ে করলে? আমায় বিয়ে না করলেই পারতে। সারাজীবন ধরে তাকেই ভালবাসাটা দিলে পারতে, আমায় এমন কাঁদান কেন?

অসিত এতক্ষণে ব্যাপারটি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে। সে হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া বলে, মেয়েছেলের কান্না দেখতে আমার বড় ভাল লাগে কিনা? যখন মেয়েরা নেকামো করে কান্নার ভান করে মুখটা রাগে সাপের মত গম্ভীর করে ফোলায় তখন দেখতে আমার কি যে ভাল লাগে তা আর কি বলব!

অসিতের কথায় পাপিয়া একেবারে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিয়া উঠে। উপায় থাকিলে বোধ হয় সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিত।

—আমাদের কান্না ভাল লাগবে বইকি। আমরা যে অবলা, পরাধীনা!—পাপিয়ার গলা ভারি হইতে বিপরীত দেখিয়া অসিত শশব্যস্ত হইয়া পাপিয়াকে আদর করিয়া বলে, ও পাপিয়া দেবী! হায়রে, মেয়ে মানুষের মন! ও যে গল্পের প্লট।

এইবার পাপিয়া সরিয়া আসে, একেবারে অসিতের কাছে। তাহার কান্না বাষ্পের মত কোথায় উবিয়া যায়। সে অসিতের বুকের উপর মাথা রাখিয়া তাহার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া তাহার গালে একটি কোমল অঙ্গুলী মৃদু সঞ্চালন করিতে করিতে বলে, সত্যি !

তখনও প্রভাত হইতে অনেক দেরী। দুইজনে আবার ঘুমাইয়া পড়ে।

দুঃখের বরষায়

বাবা মারা যাবার পর বিনয়ের দিন এক রকম কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু মাও যখন তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন তখন বিনয়ের নিরালা, নিঃসঙ্গ জীবন এক রকম তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। তাই বন্ধুবান্ধবহীন জীবনের কঠোরতাকে একটু লাঘব করবার জন্যে সে চেয়েছিল আরও পাঁচ জনের মত বিবাহিত জীবন যাপন করে সুখী হ'তে। তার আশা ছিল, একটি লজ্জাশীলা, সেবাপরায়ণা বালিকাকে একান্ত আপন করে পাবার—যে তাকে সুখে দুঃখে সর্ব্ব সময়ে সঙ্গিনী হয়ে তাকে দেবে আনন্দ, প্রেরণা। সে হ'বে তার ঘরের লক্ষ্মী, তার বিবাহিতা স্ত্রী। সে আরও অনেক কিছু আশা করেছিল—যার আগমনে তার সংসার সুখের হয়ে উঠবে—যার সেবায়, যার যত্নে তার জীবনের অল্প ক'টা দিন হবে কৃতার্থ, শান্তিপূর্ণ, ইত্যাদি, ইত্যাদি—বিনয়ের কল্পনার শেষ ছিল না।

কিন্তু তার সব আশাই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছল। মাত্র একটি বৎসর তাদের জীবন কেটেছিল আশার সঙ্গে পা ফেলে। তারপর সেই খোকা হবার পর থেকে বীথিকে যে কি রোগে ধরল কে জানে! ওষুধ, ডাক্তার সব হার মেনেছে। দু'চার দিন জ্বর হয়, দু'চার দিন ভাল থাকে

আবার জ্বর হয়। দিনের পর দিন বীথিকে এমি করে ভুগিয়ে তার জীবন নিরর্থক, কঠোর করে তোলে—শুধু বাকি আছে তার হাড় ক'খানা —চার বছরের রোগ শয্যা রোগিনীকে কেবল দিনের পর দিন উপহাস করে চলে। এতদিন বিনয় আশা করে এসেছে: বীথি ভাল হয়ে উঠবে—আর পাঁচ জনের মত সে ঘরসংসার করবে—পুত্র-কন্যার কলরবে তার ঘর মুখরিত হ'য়ে উঠবে; কিন্তু সে আশা বিন্দুর আ। আর নেই। আজ বিনয় সম্পূর্ণ নিরাশ, হতাশ হয়ে পড়েছে।

বিনয় মিলে কাজ করে। ডিউটির ভোঁ বাজলেই তাকে ছুটতে হয়। এই পাঁচটা বছর তার প্রায় অর্দ্ধাশনেই কেটেছে তবুও সে সময় মত আপিসে হাজির হ'তে পারে নি। কত ভৎর্সনা খেয়েছে সে সাহেবের কাছে কিন্তু কি করবে উপায় নেই! বীথিকে ত ভাল করতে হ'বে। রাত্রে একটি দিনও সে মনের সুখে ঘুমুতে পারে নি, কেবল রোগিণীর যন্ত্রণা-কাতর অস্ফুট শব্দ তাকে চঞ্চল করে তুলেছে। একটা দিন নয়—দুটো দিন নয়—পাঁচ পাঁচটা বছর তাকে এমি করে তিলে তিলে দগ্ধ করে মেরেছে। তার যৌবনের পাঁচটি সুখের বছর এমন ভাবে নষ্ট করে তিলে তিলে তাকে ঋণভারে জর্জ্জরিত করে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেবার বীথির কি অধিকার আছে! তার অফুরন্ত যৌবন—বুকে তার কত আশা, কত রং বেরং এর নেশা বাসা বেঁধে আছে। সে যোদ্ধার মত বুক ফুলিয়ে জগতের সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলতে চায়—সেও মানুষ, আর পাঁচ জনের মত তারও হৃদয়ে আশা, আকাঙ্ক্ষা আছে—সে ও সজীব—সে-ও সুখী—বিয়ে করেছে বলে সেই বা কেন বিড়ম্বিত হ'বে! পাঁচটি বছরের মধ্যে একদিনের তরেও সে কর্ত্তব্যে

অবহেলা করেনি—আর সে পারে না,……সে আজ আত্ম সুখ সর্ব্বস্ব, তার নিজের সুখই তার কাছে আজ সব চেয়ে বড়! তাই সে আজ জীবনটাকে উপভোগ করতে চায়। কত পূজো, কতো আনন্দের দিন গেছে কিন্তু এই পাঁচটি বছর বিনয়ের একভাবে কেটেছে —মিল আর রোগিণীর সেবা। আজ পূজোর বাজার। কলকাতায় কত লোক পূজোর বাজার করতে যাচ্ছে। সে আজ কলকাতায় যাবে। বায়োস্কোপ, থিয়েটার দেখবে, হগ মার্কেটে কেক কিনবে, খাবে যত যা আছে, কোনটা উপভোগ করতে ছাড়বে না। রোজ ন'টার পর বিনয় কাজে বেরোয়, আজ সে বামুনকে আটটার সময় ভাত দিতে বলে। যা হোক দু'টি খেয়ে সে একটা পান•চেয়ে নেয়। তারপর সেটাকে মুখে ফেলে ভাল কাপড় জামা পরে একবার বীথির কাছে যায় দেখা দিতে।

রোজকার মত বিনয় আজও বীথির কাছে বিদায় নেয়, বলে—তা হ'লে—

বীথি ও চিরাচরিত ভাবে স্নেহমাখা স্বরে আস্তে আস্তে উত্তর দেয় —এস। তারপর সে বিনয়ের বেশ ভূষা দেখে অবাক হয়ে যায়, বলে—আজ যে বড় সৌভাগ্য তবু কাপড় জামার দিকে নজর পড়েছে। আচ্ছা, আজ এত সকালে কেন যাচ্ছ গো? কাজ আছে বুঝি? তা হ'লে ও বেলা নিশ্চয় সকাল করে ফিরবে! দেখ বেশী দেরী কোর না, একা থাকতে আমার যা কষ্ট হয়। আর দেখো বড় শীত পড়েছে খোকার একটা কিছু পরবার নাই। যদি পার ত একটা জামা এন। শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে।

বিনয়ের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—খোকা কাঁপে ত আমার কি! নিজের সুখ আগে না খোকার সুখ আগে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। যাবার সময় তার চোখে পড়ে বীথির মিনতি ভরা শুষ্ক মুখখানি। যেন কালি হয়ে গেছে, বোধহয় আবার রাত থেকে জ্বর এসেছে। বিনয় হাওড়া ষ্টেশনের একটা টিকিট কেটে গাড়ীতে চেপে বসে। হাওড়া ষ্টেশনে নেমে একটা ট্যাক্সি করে সে মার্কেটের দিকে অগ্রসর হয়। কলকাতার জনকোলাহল এবং দোকান পাটের সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় সে। পাঁচটি বছরের দুঃখের জীবন আজ তার মধুময় হয়ে ওঠে। সব দুঃখের কথা ভুলে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। ভাবে—জগতে এত আনন্দের, উপভোগের জিনিষ থাকতে দুঃখ কিসের! দেখতে দেখতে নিমেষে ট্যাক্সি তাকে মার্কেটে নামিয়ে দিয়ে ভাড়া নিয়ে চলে যায়। বিনয় একটু দাঁড়িয়ে চারিধার অবাক হয়ে দেখে। হঠাৎ তার চোখ পড়ে রাস্তার একটা ভিখিরীর ওপর। কঙ্কালসার তার দেহ, দেখলে ভয় হয়, বহুদিনের অনাহারে তিলে তিলে সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। আজ সে উত্থান-শক্তি রহিত তবুও তারই মধ্যে বাঁচবার ক্ষীণ প্রয়াস—ধীরে ধীরে একটি হাত তুলে ভাষার পরিবর্ত্তে ভাবে চায় ভিক্ষা। এত জাঁক-জমকের মাঝে, এই সুন্দর রাজপথে এ দৃশ্য বড় বিসদৃশ দেখায়। বিনয় ভাবে—জগতে আমার সামনে আমার মতই মানুষ অনাহারে এক মুঠা অন্নের জন্যে মরবে আর আমি করব স্ফূর্ত্তি! তার এমন আশা পণ্ড হয়ে যায়। ট্যাক্সি আর রেল ভাড়া সে বৃথা নষ্ট করেচে ভেবে আপশোষ করতে থাকে। তারপর এক ঠোঙ্গা মুড়ি মুড়কী

কিনে ভিখিরীকে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে চারটে পয়সাও দিতে ভোলে না। এইবার মনে পড়ে তার খোকার কথা, বীথির কথা। বোধ হয় জ্বরে এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েচে। যদি গিয়ে সে আর দেখতে না পায়! কেন সে তাকে অমন করে অনাদরে ফেলে এল! বীথি হোক্ চিররুগ্না —হোক্ স্বাস্থ্যহীনা—হোক্ তার জীবন সব সুখে বঞ্চিত—তবু ত সে তার বিবাহিতা স্ত্রী! তার উপর কি জানি কেন আজ বিনয়ের বড় মায়া হয়! তার মনে হয়, যদি আজ সে নিজের প্রাণের বিনিময়ে বীথির জীবন ফিরিয়ে পায় ত তাও আজ করতে সে কুণ্ঠিত হ'বে না।

বীথি বড় ভালবাসে তাকে! সে যখন কাজে যায় তখন সারা পৃথিবীর মধ্যে উৎকণ্ঠিতা হয়ে কে তার পথ চেয়ে বসে থাকে। সে বাথি। বীথি মৃত্যুকে, আত্মহত্যাকে বড় ভয় করে। বড় সাধ তার স্বামার সেবা করবার—বড় সাধ এ জগতে বেঁচে সংসার করবার—কিন্তু ভগবান তার আশা পূর্ণ করেন নি। সেই খোকা হবার পর থেকে তাকে যা রোগে ধরেচে, একটি দিনের তরেও সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি, বোধ হয় মৃত্যু না হ'লে তার আর নিষ্কৃতি নেই! বিনয় কাজ থেকে ফেরবার পথে কত প্রার্থনা করেছে ভগবানের কাছে—হে ভগবান, আজ যেন গিয়ে দেখি বীথি ভাল হয়ে উঠেছে, সে বিছানা ছেড়ে উঠেছে—সুস্থ হয়েছে— আজ যেন সে তাকে হাসি মুখে ডাকতে পারে।

বিনয় হেঁটেই হাওড়া ষ্টেশন যাবার ঠিক করে কারণ আর সে ট্যাক্সিতে পয়সা অপব্যয় করতে রাজি নয়। হঠাৎ মোড়ে মস্ত-বড় নামজাদা বিলেত ফেরত এক ডাক্তারের সাইন বোর্ড তার চোখে পড়ে। সে সোজা গিয়ে হাজির হয় ডাক্তারের কাছে। তারপর বীথির সব কথা

জানায় ডাক্তারকে। ডাক্তার অভয় দেন—ও কিছু না। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে আরও সামান্য অন্য কিছুর ইন্‌ফেক্‌সন আছে। দু' চার শিশি ওষুধ খেলেই ভাল হয়ে যাবে। ডাক্তারের ফি মিটিয়ে দিয়ে ওষুধ কিনে বিনয় আবার হন্ হন্ করে চলতে থাকে।

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে বিনয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো, সহরের সমস্ত কলকোলাহল ছেড়ে মন তার ফিরে গেল. বাড়ীতে—রুগ্না বীথির শয্যাপার্শ্বে।—জেগে জেগে স্বপ্ন দেখল বিনয়—ঘরে ঢুকতেই সে দেখে কে যেন তার দিকে হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছে।—বীথি না? বিনয় চমকে উঠল! আজ পাঁচ পছর পর সে কি সুন্দর করে চুল বেঁধেছে, সিঁথির সিঁদুরটা লাল টকটক্ করেছে, সাদা ধপধপে কাপড়, যেন তার চেহারা একেবারে বদলে গেছে! কে বলে পাঁচ বছরের রোগীণি বীথি! বিনয় এ কথা ভাবতেও পারে না। ভাবে—তার ভুল হয়নি ত! এতই কি তার ভুল হ'বে।

বিনয় বীথিকে দেখতে পায়নি। তাই বিনয় ডাকলে—বীথি আনন্দে আটখানা হয়ে বলে, ও তুমি, এসেছ? জান, কাল তুমি যে ওষুধ এনেচ সেই ওষুধ খেয়ে দেখ একদিনেই আমি ভাল হয়ে গেছি। আচ্ছা, সুন্দর ওষুধ কিন্তু। সেই ডাক্তারকে একবার গিয়ে প্রণাম করতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। দেখ, একদিনেই যেন আমার হাতটায় একটু মাংস জন্মেছে—বলে বীথি তার ডান 'হাতটা এগিয়ে দেয় বিনয়ের দিকে।

বিনয় কিন্তু এ কথায় বিশ্বাস করতে পারে না—কেমন করে এতদিনের রোগ একদিনে ভাল হয়ে যাবে। পাঁচ বছর ধরে যার বিশ্বাস

ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে তার আজ বিশ্বাস হ'বে কি করে! যার সুখের জীবন নিরানন্দে পরিণত হয়েছে, যে আজ ঋণ-দায়ে পাগল—যার সমস্ত স্বপ্ন লয় হয়ে গেছে সে আজ কি করে বিশ্বাস করে!

অভয়কে জড়িয়ে ধরে বীথি বলে—দেখ না লক্ষ্মীটি, আমার মুখের দিকে চেয়ে। আজ আর সে কাল মুখ নেই—আজ কালো মুখ আলো হয়েছে, এই দেখ না! বলে মুখখানা এগিয়ে দেয় বিনয়ের দিকে—বিনয় বলে, ওকি ছাড়, ছাড়। হঠাৎ একটা ফেরিওয়ালা তার সামনে এক গোছা ছোট ছেলেদের জামা আর পেণ্ট ধরতেই বিনয়ের স্বপ্ন ভাঙ্গে। সে আবার বাস্তব জগতে ফিরে আসে। মনে পড়ে তার খোকার কথা। বেশ ভাল দেখে একটা গরমের জামা সে কেনে খোকার জন্যে তারপর খোকার জন্যে কিছু বিস্কুট আর বীথির জন্যে কিছু মেওয়া ফল কিনে নিয়ে বাড়ী ফেরে। যখন বিনয় বাড়ী ফিরল তখন বেলা তিনটা। সে আগেই তাড়াতাড়ি বীথির কাছে গিয়ে হাজির হয়।

সকালে স্বামী অসন্তুষ্ট হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছলেন। তাই সমস্ত দিন রোগের যাতনার উপরে বীথি বড় মনের যাতনায় সারাটা দিন কাটিয়েছে। ভয়-পাণ্ডুর মুখে বীথি বলে, আজ যে এত সকালে সকালে ফিরলে?

বিনয় কোন কথা বলে না। অপরাধীর মত বীথির মাথার কাছে গিয়ে বসে। তারপর তার মাথায় হাত দিয়ে তার শরীরের উত্তাপ দেখে, তখনও জ্বরে বীথির গা পুড়ে যাচ্ছে। বিনয় তার সেদিনের আদ্যোপান্ত ইতিহাস বলে যায় বীথির কাছে। তারপর ওষুধ, বিস্কুট, ফল সব বের করে দেখায় বীথিকে। খোকাকে ডেকে তার জামাটা পরিয়ে দেয়।

খোকা আনন্দে আটখানা হয়ে যায়। বীথির মুখে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে। বিনয় বলে, তোমার মার ওষুধ এনেছি তা খেলেই এবার ভাল হয়ে যাবে। ডাক্তারে বলেছে, ও কিছু না। তার জীবনের জন্যে স্বামীর অস্থিরতা দেখে বীথির চোখের জল টস্ টস্ করে বালিশের উপর পড়ে যায়। বিনয় লক্ষ্য করে। আর ভাবে—উঃ, চোখের জল, সেই রুগ্না স্ত্রী। আবার সেই অসহ্য পুরাতন জীবনের আবৃত্তি। আবার সেই ঋণ, আবার সেই ডাক্তারের কাছে আনাগোনা, আবার সেই দুঃখের জীবন। বিনয়ের মন বিষাক্ত হয়ে উঠল। সে ভাবে শান্তির মুখ সে কি জীবনে আর একটি দিনও দেখতে পাবে না। এতই দুর্ভাগ্য তার! সে ভগবানের কাছে দুহাত তুলে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে—হে ভগবান, ওকে ভাল কর, না হয় ওকে নাও। ওই বা আর কত সয়, আর আমিই বা কত সই! ওর সম্পূর্ণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমি—হে দয়াময়, তুমি ওকে মৃত্যু দাও, ওর মুক্তিই আমার কাম্য।

———

সরলা

ছেলেবেলায় সকলে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছিলুম। তার পর বয়ঃ-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যে যার ভাগ্যান্বেষণে দেশ বিদেশে চলে গেছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে স্নেহের বাঁধন এখনও একটুও শিথিল হয়নি। তাই সময়ে সময়ে এর কাছে ডাক পড়ে ওর আর ওর কাছে ডাক পড়ে এর। দাদা থাকেন কোন এক অখ্যাত ষ্টেশনে ষ্টেশন মাষ্টাররূপে। সেদিন চিঠি এসেছে, অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, আমি যেন এক্সমাসের ছুটিতে নিশ্চয়ই যাই। বউদিও লিখেছেন অনেক করে। সুতরাং লম্বা ছুটিতে বিদেশ বেড়ানর মায়া ত্যাগ করে দাদার কাছেই যাওয়ার স্থির করলাম।

পাহাড়ে দেশ। ট্রেণ চলেছে ধীরে ধীরে এঁকে বেঁকে। দু'ধারে শাল আর মহুয়ার বন, দূরে সারি সারি মাটির ঢিবির মত পাহাড়। মাঝে মাঝে দু' একটা পাহাড়ে নদী। আমার কামরায় যাত্রী তিন জন। আমি আর এক নববিবাহিত দম্পতি। তারা সারা রাস্তা আসছে বকতে বকতে। তাদের কথা যেন অফুরন্ত। উদ্দেশ্য আর উদ্দেশ্য-বিহীন প্রশ্ন আর উত্তর, তার কোনটা হয়ত অর্থপূর্ণ আবার কোনটা

হয়ত অর্থহীন। এম্নি তাদের চলেছে কথাবার্ত্তা। আমি একা, সঙ্গী বিহীন সুতরাং প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুভব করতে করতেই আমাকে পথটুকু অতিবাহিত করতে হ'বে। অবশ্য আমার সহযাত্রীদের বাক্যালাপও যে কানে আসছিল না তা নয় কারণ নবদম্পতির কথাবার্ত্তা সাধারণতঃ একটু মনোমুগ্ধকর হয়েই থাকে। তারা জানালার ধারের একটা বেঞ্চে সামনা সামনি মুখোমুখি হয়ে বসে আছে। গাড়ী একটা ষ্টেশনে এসে থামল। ছোট্ট ষ্টেশন। ষ্টেশন মাষ্টার ছাড়া কোন লোকজন দেখা গেল না। কোন যাত্রী নামল ও না আর কেউ উঠল ও না। সহযাত্রী ভদ্রলোকটি মহিলাটিকে ষ্টেশনটি দেখিয়ে বল্লেন, জান, এখানে এত বাঘের উপদ্রব যে, ষ্টেশন হয়ে অবধি ছ'জন ষ্টেশন মাষ্টার বাঘের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। এখানে প্রাণ হাতে করে চাকরী করতে আসতে হয়।

মহিলাটি ভয়বিহ্বল নেত্রে প্রশ্ন করেন, সত্যি ? তবে লোকে এখানে কেন কাজ করতে আসেগো ? তাদের কি একটুও প্রাণের ভয় নেই ? আচ্ছা, লোক বটে !

ট্রেণ আবার চলতে সুরু করে। নিকটেই একটা জলপ্রপাত। একটু দূরে সামনেই ছোট্ট একটা নদীরূপে তার জল বয়ে চলেছে। সহযাত্রী ভদ্রলোকটি ঐ নদীটিকে দেখিয়ে বলেন, দেখ এইখানে যত সব বাঘ আসে জল খেতে।

সেদিন ছিল চাঁদনীর রাত। আবছা আবছা দূরে নদীর জল দেখা যাচ্ছিল। মহিলাটি কান সেইদিকে আর তাঁর দৃষ্টি ভদ্রলোকটির দিকে স্থাপিত করে খানিকক্ষণ পাষাণের মত স্থির হয়ে থেকে আস্তে আস্তে

বল্লেন, সত্যি, শোন ভাল করে, ঐ বুঝি বাঘে, না না পোকায় জল খাচ্চে। আঃ, কি লোকগো তুমি, শুনতে পাচ্ছনা? অমন চকাস্ চকাস্ করে আওয়াজ হচ্ছে।

ভদ্রলোকটি অট্টহাস্য করে বল্লেন, বাঘ নয় তাও আবার সামান্য ছোট্ট একটা পোকা তার সাহস রেলের পাশে দাঁড়িয়ে জল খাবার! হাসালে দেখছি তুমি। তারপর একটু স্বর নামিয়ে মুখটি মহিলাটির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, যেই ভাগ্যি গাড়ীতে লোক নেই। তা না হ'লে আমার বউটির বুদ্ধি দেখে কি প্রশংসাটাই না করত! হায়, দুর্ভাগ্য আমার।

পুরুষের ঠাট্টায় মেয়েদের প্রাণে প্রায়ই শেল বিঁধে থাকে তাই মহিলাটি একটু বিষণ্ণ হয়ে বল্লেন, সবটাতেই ত তোমার ঠাটা! রাত্রে ওদের নাম করতে নেই জানন। আর সেদিন কি হয়েছিল? চলন্ত গাড়ীতে একটা ঐ উঠে একটা লোককে ধরে নিয়ে গেছল।

ভদ্রলোকটি আবার হো হো করে হেসে উঠলেন। আমারও যাত্রা শেষ হ'ল। গাড়ী এসে ষ্টেশনে থামতেই নেমে পড়লাম। একবার মনে মনে যাত্রীদের বিদায় দিলাম।

কাছেই কোয়াটার সুতরাং কষ্ট কিছু করতে হ'ল না। রাত তখন আটটা হ'বে। সাধারণতঃ দাদার সন্ধ্যে থেকেই ডিউটি পড়ে, জানি তিনি বাড়ী নেই, তাই দাদার বড় ছেলের নাম করে ডাকাডাকি সুরু করলাম, বোধ হয় তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল তাই কারও সাড়া পেলাম না। দোর বন্ধ ছিল। অনেকক্ষণ পর কে এসে ধড়াস্ করে দরজার খিল খুলে দিলে। দরজায় ঠেলা দিতেই দেখি, সামনে একটি প্রাপ্ত যৌবনা নারী।

সে আমার দিকে একটু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল। যেন কি একটা নোতুন জীব দেখেছে। হয়ত বা কলকাতার জীবকে দেখে সে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছল। তারপর সে হাত বাড়িয়ে আমার স্যুটকেশটা নিয়ে চলে গেল। আমিও কেমন যেন হয়ে গেছলুম। বাড়ীতে ঢুকতেই শুনলুম কে যেন বলছে, কে এসেছে দেখ বৌদি!—যেন আগন্তুকের আগমনে সে কত খুশী হয়েছে, এম্নি তার ভাব। বৌদি তখন ঘরে দোর লাগিয়ে কি একটা মাসিক পত্র পড়ছিলেন। তিনি বেরিয়ে এসে আমায় দেখেই বল্লেন, ও, ঠাকুরপো এসেছ? তা ভাই একটা চিঠিও কি দিতে নেই?

বল্লাম, তোমরা আসবার জন্যে লিখলে আবার আমি কি চিঠি দোব। দাদা কোথায়?

তার কথা আর বল কেন? ডিউটি আর ডিউটি। ও 'বউ' যা'না তোর দাদা বাবুকে জলটল তুলে দেনা। মুখ হাত ধুক ততক্ষণ। আর দেখ, দুধটা নামিয়ে উনুনে দুটো কয়লা ফেলে দে। যাহ'ক করি আর দু'খানা লুচি ভেজে দিই।

কলতলায় মুখ হাত ধুতে ধুতে শুনলাম 'বউ' বলছে, ঐ বুঝি তোমার ঠাকুরপো বৌদি? ওঁরই আস্‌বার কথা বলছিলে সেদিন?

খেতে বসে বৌদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, ও কে বৌদি? বৌদি বল্লেন, ঝি। মাস খানেক হ'ল ওকে রাখা হয়েচে। খুব খাটতে পারে, মুখে কথাটি নেই। সংসারটা ঐত মাথায় করে রেখেছে এখন। গরীব লোকের মেয়ে দুটি খেতে পেলেই হল। উদয়াস্ত খাটচে একটুও বসে থাকা ওর পোষায় না। যাই হোক তবু ওটা জুটেছে বলে আমার অনেকটা

রেহাই। বাটনা বাটা, কুটনো কোটা, ঝাঁট দেওয়া, বিছানা করা, ছেলে নেওয়া, জল তোলা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা ইত্যাদি সবই ত ঐ একা করে। আমি খালি ছুটি নেড়ে নিই। সেই কাক পক্ষী ডাকতে না ডাকতে আসে আর যায় রাত ন'টায়। এই পাশেই থাকে, ডাকলে হাঁকলে রাত্তিরেও এসে হাজির হয়।

সকাল বেলা উঠেই দেখি, 'বউ' এসে তার কাজ আরম্ভ করে দিয়েচে। ছিপ্‌ছিপে্ তার চেহারা। পাহাড়ে নদীর মত চঞ্চল! বিদ্যুতের মত তার অঙ্গ ভঙ্গী। পরণে লাল একটা শাড়ী। একটি সায়া আর একটি ব্লাউজ, বোধ হয় বৌদির দেওয়া। শীতকাল তার উপর পাহাড়ের দেশ তবুও তার আর এর বেশী কিছু দরকার হয় না। এই তার আকাঙ্খার অতীত। সব চেয়ে চোখে পড়ে তার মাথার সাদা সিঁথিটি। যেন ছু' ধারে বনানীর অন্ধকারের ভেতর পড়ে আছে সাদা শুষ্ক একটি বালুকা-ময় নদী। চঞ্চল হরিণীর মতই সে তার কাজের মাঝে আপন মনেই থম্‌কে থম্‌কে দাঁড়াত আর মৃদু হাসত। এই হাসিতেই প্রকাশ পেত তার গোপন অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত। বড় সরল ছিল সে হাসি। কাল ছিল তার রং, কিন্তু দাঁতগুলো ছিল যেন এক একটা ঝক্‌ঝকে মুক্তা। ঠোঁট ফাঁক হলেই তা থেকে সাদা আভা বেরিয়ে তার মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করে তুলত। বিধাতার সরলমনা নারী সৃষ্টির সে ছিল আদর্শ। মান, অপমান, লজ্জা বলে সে কিছু জানত না। একটা উড়োজাহাজের শব্দ পেলে সে সারা বাড়ীময় ছুটে বেড়াত আর চেঁচাত, এত কৌতূহল তার যে, দেখলে মনে হয়, সে সারা বিশ্বকে ডাকছে তার প্রাণ দিয়ে, একবার দেখে যাবার জন্যে ঐ অদ্ভুত উড়ো জাহাজ, কিন্তু সবই হ'ত তার বিফল।

জনমানবহীন দেশে কেউ আসত না তার ডাকে। সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকত সেই উড়ো জাহাজের দিকে যতক্ষণ সেটাকে দেখতে পাওয়া যায়। তারপর সে এসে আবার নিজের কাজে লেগে যেত আপন মনে।

একদিন বৌদিকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, ওর বিয়ে হয় নি? ওদের ত খুব ছেলেবেলায় বিয়ে হয়।

বৌদি একটু দুঃখ করে বল্লেন, ওর কপাল। সবই হয়েছিল।

—তা ও ঐ রকম কাপড় পরে, মাছ খায়?

—তা আর কি করবে বল। সে কি ওর মনে পড়ে। তখন ওর বয়স মাত্র ন' বছর। ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছিল কিনা তাই ও কিছু বাছ বিচার করে না।

—আচ্ছা ওর কি নাম? দরকার হ'লে কি বলে ওকে ডাকব?

—আমি যা বলি। 'বউ' বলেই ডাকবে।

—ও যদি রাগ করে। কারও 'বউ' বুঝি নাম হয়? তুমি ওকে 'বউ' বল কেন?

—ওর নাম আমার করতে নেই তাই ওকে 'বউ' বলি।

এই গেল তার পরিচয়। সঙ্গে কতকগুলো নূতন রেকর্ড আর একটা গ্রামোফোন নিয়ে গেছলুম। সেদিন সন্ধ্যে বেলায় সেটা লাগাতেই দেখি 'বউ' কোথা হতে ছুটে এসে বসে পড়ল আমার পাশে। একটুও লজ্জা বা দ্বিধা নেই। উৎসুক হয়ে সে আমাকে প্রশ্ন করলে, কে ওর ভেতর গান গায় দাদাবাবু? মানুষ আছে বুঝি?

আমি বল্লাম—হেঁ।

—কতটুকু মানুষ?

এই এ—ত টুকু।

তাই সে খুসী হয়ে বিশ্বাস করে বসে বসে শুনতে থাকে। ওদিকে কাজ ফেলে আসার জন্যে বৌদি ডাকাডাকি সুরু করেছেন। একটু বাদেই সে অতৃপ্ত হয়েই ছুটে চলে গেল। আমি তার সরলতায় অবাক হয়ে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম।

রেকর্ড শেষ করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল। 'বউ' তার কাজ সেরে বসে বসে শুনছিল তাই তার বাড়ী যাওয়া হয়নি। আমায় খাবার দিয়ে পরে বউকে খেতে দিলে আবার অনেক দেরী হয়ে যাবে বলে আমায় খাবার দিয়েই বৌদি তাকে খেতে দিলেন। সে একটা থালা নিয়ে আমার পাশেই বসে পড়ল! ছোট্ট মেয়ের মতই সে এটা সেটা নাড়'চাড়া করে খেতে সুরু করে দিলে। ওদিকে খোকন চেঁচাতে সুরু করেছে। খাবার ফেলে সে ছুটল। বড় ভালবাসে সে দাদার ছেলেমেয়েদের। তাদের কান্না সে একটুও সহ্য করতে পারে না। এক হাতে সে ছেলেকে কোলে করে ভোলাতে লাগল। কিন্তু সে থামতে চায় না। তার বিকট কান্না শুনে মুখ ফিরিয়ে আবছা অন্ধকারের ভেতর দেখলাম এক অদ্ভুত দৃশ্য যা জীবনে বোধ হয় আর কখনও দেখতে পাব না। খোকাকে সে বুকে চেপে ধরে স্তন তার মুখে গুঁজে দিচ্ছে, কিন্তু দুধ না পেয়ে খোকা রাগে দ্বিগুণ শব্দে চীৎকার সুরু করে দিয়েচে। খোকাও যত চিৎকার করে সেও তার মুখ তত তার বুকে চেপে ধরে। খোকার ক্ষুধাতুর আগ্রহ-ব্যাকুল মুখ দেখে সে নিজের বক্ষকে চিরে দুধ বার করতে চায়। সেদিন সেই মাতৃমূর্ত্তি দেখে আমি বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেছলাম, আর ভেবেছিলাম

—যদি আমি ভাস্কর হ'তাম ত এর প্রস্তর মূর্ত্তি তৈরী করে জগতে আমি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতাম।

যে কদিন ছিলাম তার সঙ্গে আমার একটিও কথা হয়নি। আমরা সভ্য নাগরিক, যুক্তি তর্ক নিয়ে বেঁচে থাকি তাই তার সঙ্গে একদিনও একটি কথা বলবার সাহস করে উঠতে পারিনি। নিজের মনেই বসে বসে তার সরলতার কথাই ভাবতাম আর তার দিকে চেয়ে থাকতাম। সেও জানি না কেন কাজের মাঝে এক একবার ভীতা হরিণীর মতই গ্রীবা তুলে আমার দিকে একবার তাকিয়ে একটু হেসে আবার নিজের কাজে মন দিত।

আজ সন্ধ্যায় আমার বিদায়। কদিন দাড়ি কামান হয়নি কারণ জংলি দেশে দরকার হয়নি। আজ আবার সহুরে হয়ে সহরে ফিরতে হবে। এসে অবধি আগের দিনের রাত ছাড়া 'বউয়ের' সঙ্গে বিশেষ কিছুই কথা কইনি। আজ বিদায় ক্ষণে তার সঙ্গে একটু কথা কয়ে তার মনে আমার একটু স্মৃতি রেখে যাবার জন্যে মনটা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। তাই বল্লাম, 'বউ' আরসীটা, সাবান আর ক্ষুর, সব নিয়ে এস তো!'

এমন সুন্দর আরসী সে কখনও দেখেনি। একদৃষ্টে সে মুকুরে নিজের মুখ দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে আসছিল। হঠাৎ দেওয়ালে লাগল ধাক্কা। হাত থেকে গেল পড়ে আমার সাধের দিনমানের সঙ্গী আরসী। দৌড়িয়ে গিয়ে তুলে নিয়ে দেখলাম, এক কোণে একটু ফেটে গেছে। চার টাকা দিয়ে নূতন আরসী সবে মাত্র কিনে এনেচি, মনে বড় দুঃখ হ'ল। সেটা আর চোখের সামনে রেখে চোখের পীড়া বাড়াতে ইচ্ছে হ'লনা। তাই

বল্লুম, একটু দেখে আসতে পারনা। যাও ওটাকে ফেলে দিয়ে এস, ও আর কি হবে ?

কা'কে কতটুকু কি কথা বলা উচিত সে জ্ঞান তখন আমার ছিল না। দেখলুম তার চোখ দু'টি জলে ভরে গেছে, মুখটা ফুলে উঠেছে। সে আঁচল দিয়ে তার চোখ দু'টিকে মুছে আরসী নিয়ে চলে গেল।

তখন সন্ধ্যে হয় হয়। আর পাঁচ মিনিট বাদেই ট্রেণ আসবে। বৌদির কাছে বিদায় নিলাম। 'বউ' তখন উঠান ঝাঁট দিচ্ছিল। আমার কথা শুনেই সে ছুটে এসে ঝাঁটা হাতে দাঁড়াল সদর দরজায়।

একটু পরেই দেখি—কে যেন আমার পিছনে ছুটে আসচে। ফিরে দেখি 'বউ', হাতে তার আমার সেই আয়না। বল্লে, 'এটা নিয়ে যাবেন না? নিয়ে যান না, কলকাতায় কত বড় বড় মিস্ত্রি আছে সেরে দেবে।' সরলমনা নারী জানে না যে, কাঁচে জোড়া লাগিয়ে নূতন করবার মত মিস্ত্রি কলকাতাতেও নেই। দেখলাম, তার চোখ ছল্ ছল্ করছে—ওই বুঝি তার কান্না উছলে পড়ে!

বল্লাম, 'দাও।'

সে হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে দিলে আমার হাতে। হাসিতে তার মুখ ভরে উঠল। আবার সেই সরল হাসি! একটু পরেই সে ঢিপ্ করে আমার পায়ের উপর উপুড় হয়ে একটা প্রণাম করে বল্লে, গড় হই দাদা বাবু, আবার আসবেন।

শেষ বিদায়ক্ষণে তার সরলতাই আমায় মুগ্ধ করল। আর তার সেই সরলতার স্মৃতি বুকে করেই আমি ফিরে এলাম। শুধু দিয়ে এলাম তার

পরিবর্ত্তে আমার সেই অসার আরসী। ট্রেণে উঠে বসে তার দিকে ফিরে তাকালাম। ট্রেণ চলতে লাগল। দেখলাম, সরলা বালিকার মতই সে আরসী বুকে করে আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে চোখের সামনে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্বামী-স্ত্রী

যারা নিজেদের দেশ ছাড়া, সহর ছাড়া, গ্রাম ছাড়া কিছু জানে না তারা একরকম আছে ভাল। যাদের ভেতর দেশ ভ্রমণের মত্ততা বা আনন্দ জাগেনি, তারা সারাটা বছর এক রকম একটানা ভাবে দেয় কাটিয়ে। তবে আজকাল রেল কোম্পানীর কৃপায় এবং সহরের একঘেয়ে, নিরানন্দ জীবনের তাড়নায় অনেকে তাদের অবসর সময়ের ক'টা দিনে বাইরে হেসে খেলে কাটিয়ে আসবার জন্য উন্মুখ হয়ে পড়ে। পূজোর ছুটির একমাস পূর্ব্ব থেকেই সকলে কাজকর্ম্ম ফেলে টাইম-টেবিলের পাতা উল্‌টোতে থাকে। পূজোর সময় যে বাইরে যেতে পায় সেই ভাগ্যবান; যার যাওয়া হয় না সে ঘরে বসে বসে নিজের ভাগ্যকে শত ধিক্কার দেয়।

আজ প্রায় বছর খানেক হ'ল সমীরের সঙ্গে নীলিমার বিয়ে হয়েচে। এক বছর পরে সবেমাত্র পূজোর ক'দিন আগে নীলিমা এসেছে সমীরের কাছে। পূজোটা নিশ্চয়ই সে বাপের বাড়িতে কাটিয়ে আসত; কিন্তু সে যে কেন হঠাৎ এসে গেল সমীরের কাছে—এইটে হয়ত অনেকের কাছে একটু আশ্চর্য্য ব্যাপার বলে ঠেকবে। এতে কিন্তু আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। একটু ভেবে দেখলেই এর গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার হয়ে পড়বে এবং সেটা হচ্ছে যে, সমীর নীলিমাকে তাদের বাড়ীতে বার বার করে এই

প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল যে, সে যদি পূজোর আগে যায় ত তারা দু'জনে নিশ্চয় একটা কোথাও ভাল জায়গায় বেড়াতে যাবে, তবে কোথায় যে যাওয়া হ'বে সেটা স্থির হবে সমীরের বাড়ীতে। তাই নীলিমার শুভানুগমন সমীরের বাড়ীতে।

টাইম-টেবিল এবং ট্রাভেল ডায়েরী নিয়ে সপ্তাহ খানেক পর তাদের স্থির হ'ল যে, তারা হাজারীবাগ হয়ে মোটরে রাঁচী যাবে।

ষষ্ঠী পূজোর দিন। চারিধারে কাঁসর ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সমীরদেরও রাঁচী যাবার তোড়জোড় সুরু হয়ে যায়। রাত্রি ৮টায় ট্রেণ। সেদিন রাত্রে হাওড়া ষ্টেশনে সেকি বিপুল জনসমুদ্র! ঠিক মৌমাছির চাকে ঢিল মারলে তারা যেমন কিল্ বিল্ করে ওঠে তেম্নি কেবল যেন তাদের কাল কাল মাথাগুলো চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। যদিও সকলেই জানে যে সেদিন অনেককে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আস্‌তে হ'বে তবুও সকলেই সেদিন সেই গাড়ীতে যাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করুচে—ফলে লোহার রেলিং বেচারীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। সমীর ও নীলিমা হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে এই সব ব্যাপার। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা এই সব মজা দেখে আনন্দ পাবার জন্যেই বোধ হয় রেল কোম্পানীকে এত বেশী ভাড়া দেয়! তা না হলে শুধু আরাম করে যাবার জন্যে বোধ হয় কখনও এত ভাড়া দিত না। সমীর ও নীলিমা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। স্প্রিং দেওয়া গদীর ওপর আর একটা করে গদী বিছিয়ে নিয়ে তারা আরামে রাত্রি কাটাবার বন্দোবস্ত করে নিল। তারপর ডিম লাইটটি জেলে তারা একটি বিছানায় দু'জনে পাশাপাশি বসে টাইম-টেবিলের পাতার পর পাতা উল্‌টে গল্প করতে করতে চল্‌ল। ট্রেণ ছুটেছে হু হু

করে তার সম্মান-গতিতে। যখন সেটা বর্দ্ধমানে পৌঁছল তখন রাত প্রায় বারটা। সমীরের এক বন্ধুর এখানে দেখা করতে আসার কথা ছিল তাই ট্রেন প্লাটফর্মে ঢুকতেই সমীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রুমাল উড়াতে লাগল, কিন্তু বন্ধুর আর দেখা পাওয়া গেল না। বর্দ্ধমানের কত লোক সেই গাড়ীতে ওঠবার জন্য মারামারি সুরু করে দিলে। সমীর খানিকক্ষণ এইসব দেখে ফেরীওয়ালাদের কাছে বর্দ্ধমানের মিহিদানা, সীতাভোগ পরখ করে দেখল। তারপর কিছু বর্দ্ধমানের নামজাদা জিনিষ কিনে নিয়ে ফিরে গেল তার কামরায়। টেণ দিল ছেড়ে।

নীলিমা জিজ্ঞেস করে, ওসব আবার কি ?

সমীর হেসে উত্তর দেয়—এ বর্দ্ধমানের ফেমাস্, ফেমাস্—

নীলিমা সন্তুষ্ট হয় না তাই ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে মুখটা ফিরিয়ে বলে—ফেমাস্ না ছাই ! ছাই পাঁশ যা হোক কিনলেই হ'ল ? বর্দ্ধমানের যা ফেমাস্ কল্‌কাতার তাই অর্ডিনারী, কলকাতার যা ফেমাস্ তা আবার লণ্ডনে কেউ হাতে করেও দেখে না। এই সামান্য একটু লজিকেরও জ্ঞান নেই তোমার !

সমীর হাতের জিনিষগুলো রেখে দিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ে নীলিমার পাশে গিয়ে, তারপর তার বাহুটা একটু চেপে ধরে বলে, বেশ বেশ, কাল যখন মটরের হাওয়া লেগে রাস্তায় ক্ষিধে পাবে তখন বুঝবে ওর কি মূল্য ! তখন ও কলকাতার অর্ডিনারী থেকে ফেমাস্ হয়ে দাঁড়াবে। ফেমাস্ কেন তারও উচ্চে—একেবারে স্বর্গের অমৃতভোগ।

নীলিমা কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট হয় না, সে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—বেশ বেশ, তোমার অমৃতভোগ তুমি খেও, আমি যা এনেচি তাই খাব।

ছাই পাঁশ কেন ও-গুলো কিনলে বল দিকিন? যদি খেয়ে তোমার অসুখ করে? তার চেয়ে ফেলে দাও ও-গুলো। না হয় একটা টাকাই যাবে।

সমীরেরও জিদ বেড়ে যায়, সে বলে, হ্যাঁ, মরে যাব একবারে! কালকে আগে আমি ওগুলো শেষ করে তবে কলকাতার আর বাড়ীর খাবারে হাত দেবো।

এম্নি করে সামান্য জিনিষ নিয়ে তাদের তুমুল তর্ক ও সমস্যার মধ্যে দিয়ে গাড়ী এসে পৌঁছল আসানসোল ষ্টেশনে। ক্ষান্ত হ'ল তাদের কথাবার্ত্তা। সমীর নেমে পড়ল কামরা থেকে আবার একবার যাত্রীদের ভীড় দেখবার জন্যে। থার্ডক্লাস কামরাগুলোয় একেবারে মাছি গলবার পর্য্যন্তও জায়গা নেই বল্লেই হয়! যাতে আর লোক না ঢুকতে পায় সেই জন্যে তারা দরজাটা বস্তা, পেঁটরা দিয়ে আটক করে রেখেছে। কারও সে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু এতেও নিস্তার নেই। জল যেমন যেদিকে ছিদ্র পায় সেই দিকেই ছুটে চলে তেম্নি খোলা জানলা দিয়ে মালপত্র এবং যাত্রী পুকুরে জাল দেবার সময় রুই কাতলা মাছ যেমন একধার থেকে অন্য ধারে লাফিয়ে পড়ে তেম্নি করে বাইরে থেকে এসে পড়ছে কামরার ভেতরে। জানলা বন্ধ করলে এ অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু সে সুখেও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা বঞ্চিত কারণ যদি জানলা বন্ধ করা হয় তা হ'লে এত গুলি লোক দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। সমীর এইসব দেখে গিয়ে সব বর্ণনা করতে লাগল নীলিমার কাছে। নীলিমা অবাক হয়ে শোনে এই সব হতভাগার দলের কাণ্ড

আর হাসে মনে মনে। তার পর তারা দু'জনেই কখন ঘুমিয়ে পড়ে! যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন প্রায় ভোর হয় হয়। সেটা ঈশ্রী ষ্টেশন। ষ্টেশনের লোক ঈশ্রী, ঈশ্রী বলে বার বার হাঁকছে। সমীর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল আর নীলিমা আরও একটু জায়গা পেয়ে তার অলস দেহটাকে বেশ করে ছড়িয়ে দিলে। সমীর টাইম-টেবিল দেখে আবিষ্কার করলে—মাত্র আর দু' একটা ষ্টেশন বাকী। নীলিমাকে ঠেলা দিয়ে সমীর বলে—এই শুনছ, এখানে নামবে? পরেশনাথটা হয়ে যাওয়া যেত। খুব উঁচু নাম-করা পাহাড়।

নীলিমা তার অলস চোখ দু'টাকে একটু বিস্ফারিত করে বলে, আমার যা ঘুম এসেছে হাজারীবাগে নামতে পারলে হয়। হ্যাঁ, তারপর রাত্রে এখানে নামি আর প্রাণটা হারাই আর কি, বেশ বলেছ। চুপ করে বসে থাক, হাজারীবাগ এলে আমাকে ডেকো।

হাজারীবাগে যখন গাড়ী এসে থামল তখন ভোরের ঝাপসা ঝাপসা আলো পৃথিবীটাকে ঢেকে রেখেছে। সমীর ও নীলিমা নিজেদের সব জিনিষপত্র নিয়ে নেমে পড়ল। রেল তাদের নামিয়ে দিয়ে আবার ছুটে চলল তার গন্তব্যপথে। ষ্টেশনে মুখ হাত ধুয়ে, ফ্ল্যাস্কে নূতন করে জল ভরে নিয়ে সমীর ও নীলিমা বেরিয়ে এল ষ্টেশনের বাইরে। ট্যাক্সী করে হাজারীবাগ টাউন যাবার তাদের ইচ্ছে ছিল কিন্তু ভাগ্যে তা আর হ'ল না। মাত্র দু'খানা ট্যাক্সী ছিল তাও তারা আসার আগে কতক-গুলো সাহেব তা দখল করে বসে পড়েছে। তারা বোধ হয় কোথাও শীকার করতে যাবে—পরনে শিকারীর পোষাক আর ঘাড়ে সকলের এক একটা বন্দুক; ট্যাক্সী না পাওয়ায় অগত্যা সমীরদের বাসে যাওয়াই

স্থির করতে হ'ল। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই সে এক মহা সমস্যা—হোয়াইট, ইওলো না গ্রীণ কোন কোম্পানীর বাসে যাওয়া যায়। সকলেই বলে তাদের বাস ভালো, তাদের বাসই সবার থেকে আগে গিয়ে পৌঁছবে, ইত্যাদি। শেষে যা হয় হ'বে ভেবে সমীর মালপত্র নিয়ে হোয়াইট কোম্পানীর গাড়ীতেই গিয়ে উঠে বসল। তারপর দু'খানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিটের দক্ষিণা স্বরূপ তাকে তখনই তিনটি টাকা বার করতে হ'ল।

তখন সবেমাত্র সূর্য্য উঠছে, লাল তার রং, ডবল তার আকৃতি। ষ্টেশনের অপর দিকে একটা মস্ত বড় পাহাড়ের সারি তার, মাঝ থেকে সূর্য্যদেব আস্তে আস্তে উঁকি মারছেন। সমীর ও নীলিমা বসে বসে তারই রংপরিবর্ত্তন দেখছে একমনে। কিছুক্ষণ বাদে সমীরের একটা কথা মনে পড়ে যায়—তার এক বন্ধু বলেছিল যে, ষ্টেশনের কাছে একটা দোকান আছে সেখানে যা সুন্দর কচুরী ভাজে অমন আর কোথাও পাওয়া যায় না। সে নীলিমাকে বলে তার বন্ধুর কথা। নীলিমা আর পূর্ব্বরাত্রের মত ঝগড়া করে না, বলে, তা ভাল হ'লেই বা আর আমাদের কি দরকার? তোমার ত ঐ পেট, যা এনেচি বাড়ী থেকে তাই খেয়ে ফুরতে পারলে না।

এমন সময়ে বাস ছেড়ে দেয় সহরের উদ্দেশে। আর সকলের মুখেই শোনা যায় পৌঁছোবার অস্থিরতা। কেউ বলে, বাবা, ষাট মাইল যেতে অন্ততঃ ছ'ঘণ্টা লাগবে। আবার কেউ বলে, না না চার ঘণ্টা লাগে ত খুব লাগবে। কেউ আবার বলে ওঠে, যদি রাস্তা খারাপ হয় ত আজ পৌঁছোতে হ'বে না। এম্নি করে বাস যখন ষ্টেশন থেকে মাইল দু'য়েক

এসে পড়ল তখন দূরে দু'ধারে খালি পাহাড়ের সারি দেখা যাচ্ছে। একজন একটা পাহাড় দেখিয়ে বল্লে, এই পাহাড়ে যা ভালুক আছে মশায়। আর একজন আর একটা পাহাড়ের বাঘের ইতিহাসের কথা বলে যেতে লাগল। সমীর ও নীলিমা অপরের গল্প শুনতে শুনতে তাদের বাড়ী থেকে আনা খাবার খেতে খেতে প্রায় অর্দ্ধেক শেষ করে ফেললে। তাদের খাওয়া শেষ হ'লে বাস চলে আসল এক ফরেষ্ট ডিপোর আপিসের সামনে। সেখানে কতকগুলো কি জিনিষ নামিয়ে দিয়ে বাস আবার উঁচু নীচু রাস্তা দিয়ে ছুটে চল্‌ল। বেলা প্রায় ন'টার সময় বাস এসে থামল গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড়ের উপর। এখানে এক ভিখারীর কি জালাতন —ইংরাজী ছাড়া সে কথাই বলে না। নীলিমা সমীরকে বলে, আচ্ছা বলতে পার ও অত ইংরাজী শিখল কি করে? বোধ হয় ভদ্দর লোকের ছেলে টেলে ছিল, নয়?

সমীর বলে - হ্যাঁ, তাই হবে।

নীলিমা ব্যাগ থেকে একটা আনি বার করে তার হাতে দেয়।— বাস আবার চলতে থাকে।

তারপর বাস এসে থামে এক বিলাতী হোটেলের সামনে। হোটেল কর্ত্রী এক স্থূলকায়া ইংরাজ মহিলা। কোন খদ্দের আছে কি না তিনি একবার দেখলেন তারপর চলে গেলেন। এই ভদ্র ইংরাজ মহিলাকে নিয়ে সমীর নীলিমার কাছে অনেক কথা বলেছিল—আচ্ছা, নীলিমা তোমার যদি শরীরটি ঠিক ঐ রকম হয় ত কেমন হয় বল দিকিন? ঠিক হ'বে, দু'চারটে ছেলের মা হ'লেই হবে।—সমীর এই কটা কথা খুব আস্তে আস্তে বলেছিল নীলিমাকে কেবল তাকে রাগাবার জন্যে। নীলিমা কিন্তু

একটি কথাও বলেনি কারণ গাড়ীশুদ্ধ লোক তা হলে বেশ দেখবে তাদের মজা। পূর্ব্বরাত্রে ট্রেনে হ'লে বোধ হয় নীলিমা এমন একটা কঠোর ব্যবস্থা করত যে, যাতে করে সমীর আর কখনও সাহস করত না নীলিমাকে অমন কথা বলে ঠাট্টা করবার। এক-গাড়ী লোক, তাই নীলিমা গুম্ হয়ে আপন মনে আপনি গুমরে মরতে থাকে।

প্রায় বেলা সাড়ে দশটার সময় বাস এসে পৌঁছল হাজারীবাগ সহরে। এক মহিলা, তিনি হাজারীবাগ কলেজের এক প্রফেসরের আত্মীয়া। তাঁর নামা উচিত ছিল কলেজের কাছে, কিন্তু তিনি সেখানে না নেমে আনমনে চলে এসেচেন একেবারে সহরের ভেতরে। এখন মহা সমস্যা! তিনি ত কাঁদ কাঁদ। নীলিমা তাকে বুঝিয়ে একখানা রিক্সা করে তাকে পাঠিয়ে দেয় কলেজের উদ্দেশে।

তারপর সমীর ও নীলিমা বেরিয়ে পড়ে হোটেল খোঁজবার উদ্দেশে কিন্তু ভাল হোটেল মেলে না একটাও, শেষে তারা দাঁড়ায় একটা বড় পাতকুয়ার কাছে। ফ্ল্যাস্কের জল এতক্ষণে নিঃশেষ হয়ে গেছে, নূতন করে তাতে আবার পাতকুয়ার সুমিষ্ট, সুশীতল জল ভরে নেয় সমীর। তারপর পাশেই দেখে তারা হাজারীবাগ পোষ্ট অফিস। একখানা চিঠি লিখে ফেলে দেয় সমীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে। তারপর খানিকখন কেটে যায় তাদের উপায় নির্দ্ধারণ করতে। শেষে এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েই ওঠার স্থির করে সমীর ও নীলিমা বেরিয়ে পড়ে সেই বাড়ীর খোঁজে।

যখন বন্ধুর বাড়ী আবিষ্কার হ'ল তখন বারটা। বন্ধু ত বন্ধুর অপ্রত্যাশিত আগমনে একেবারে অবাক। সমীর বন্ধুর কাছ থেকে যে খুব ভাল ভাবেই অতিথিসৎকার পেল তা আর বলবার প্রয়োজন নেই

কারণ বন্ধুর সঙ্গে যদি বান্ধবী থাকে ত তার অবাধ গতি, যেখানে যাবে সেখানেই রাজার হালে থাকতে পাবে। দু'দিন বন্ধুর বাড়ীতে থেকে সীতা কুণ্ড এবং দু'চারটে বড় বড় যা পাহাড় দেখবার আছে দেখে তৃতীয় দিনে একটা টেক্সি দশটাকায় ভাড়া করে সমীর ও নীলিমা বেরিয়ে পড়ে রাঁচীর উদ্দেশে। ঘণ্টাখানেক চলবার পর মোটরটা একটা পাহাড়ে উঠতে থাকে। এইস্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য নাকি অতি মনোরম এবং এই প্রাকৃতিক দৃশ্যই নাকি অনেক মত্ত লোককে টেনে আনে এখানে। গাড়ী পিচের রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগল পাহাড় বেয়ে। পাশেই কি গভীর খাদ! নীচে গাছগুলোকে মাঠের ঘাস বলে ভ্রম হয়! মোটর এমন পাহাড় ঘুরে ঘুরে ওঠে যে, সামনে কোন কিছু যদি আসে ত তা দেখতে পাবার উপায় নেই। ভয়ে নীলিমা ড্রাইভারকে আস্তে আস্তে গাড়ী চালাবার জন্যে অনুরোধ করে, কিন্তু যে যাতে অভ্যস্ত তার কি তাতে ভয় হয়! ড্রাইভার একটু হাসে, নীলিমার কথায় কর্ণপাত করে না। গাড়ীটা যখন প্রায় পাহাড়ের শীর্ষে উঠে পড়েচে তখন পাশের পাহাড়ের অনেক উঁচু মাথার উপরের একটা রাস্তা দেখিয়ে ড্রাইভার বলে যে, ঐ রাস্তাটা ছিল সাবেকের রাস্তা, একটা লরী উল্টে যাবার পর থেকে ও রাস্তা বন্ধ করে এই নূতন রাস্তা তৈয়ার হ'য়েচে। তারপর ড্রাইভার এই পাহাড়ের বড় বড় সাপের আর বাঘের গল্প সুরু করে। তখন মোটর পাহাড় থেকে নামতে সুরু করেচে। আর পেট্রোলের খরচা নাই প্রায় নয় মাইল। কারণ পাহাড়ের উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত রাস্তার দৈর্ঘ্য প্রায় নয় মাইল। শেষে গাড়ীতে জল দেওয়ার প্রয়োজন হওয়ায় গাড়ী পাহাড়ের মাঝখানে একটা সরোবরের কাছে এসে দাঁড়ায়।

চতুর্দ্ধারে পাহাড়, তারই মাঝে ছোট্ট সরোবর আর ফটিক সম তার জল। অন্য কিছু দেখা যায় না জলে, কেবল ছোট ছোট পুঁটি মাছগুলো খেলে বেড়াচ্চে। এই সরোবরের ধারে সমীর ও নীলিমা গিয়ে বসে তাদের খাবারের বাক্স নিয়ে। কিছু খাওয়া দাওয়া করে তারা আবার এসে ওঠে মোটরে। পুনরায় মোটর চলতে থাকে। নীচে চাইলে দেখা যায় পাতালে বোধ হয় মোটরটা ঢুকবে। আবার একটু দূরে দৃষ্টি পড়লে অবাক হ'তে হয়, মনে হয় বুঝি পাতাল থেকে আবার স্বর্গে উঠতে হ'বে। এম্নি করে গাড়ী প্রায় রাঁচি সহরের কাছে এসে পড়ল। দূরে সাদা সাদা বাড়ীগুলো দেখা যেতে লাগল। রাঁচী সহরে ঢোকবার আগে প্রথমেই দুর্গ প্রাকারের মত প্রাচীর দেওয়া একটা প্রাসাদ নীলিমার চোখে পড়ে। সে সমীরকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে এ বাড়ীর আদ্যোপান্ত ইতিহাস জেনে তবে ছাড়ে। শেষে গাড়ী এসে দাঁড়াল শান্তিনিবাসের সামনে। দশটা টাকা দক্ষিণাস্বরূপ দিয়ে সমীর বিদায় করে দেয় ড্রাইভারকে। তার পর পেছন ফিরে তাকাতেই দেখে স্বয়ং হোটেলের ম্যানেজার উপস্থিত এবং মালপত্র তারই মধ্যে হোটেলে গিয়ে উঠেছে। প্রত্যহ আড়াই টাকা করে প্রত্যেকের দেবার এবং চারদিন থাকবার প্রতিশ্রুতি ম্যানেজার বাবুর খাতায় লিখে দেবার পর সমীর এবং নীলিমা দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেল-জীব বলে পরিগণিত হ'ল।

সকাল বেলায় নারীর মধুর সুললিত কলকণ্ঠের গীতিতে সমীরের ঘুম ভাঙ্গে। সে চোখ চেয়ে চেয়ে শোনে সেই গান। গান হচ্ছে তার পাশের ঘরেই। সে ঘরে থাকে কলকাতা থেকে আগত তাদের মতই দু'টি প্রাণী। সমীর ঠেলা দেয় নীলিমাকে। বলে—আমাদের একটা

গানটান হবেনা ? দেখ দিকিন, ওরা কেমন উপভোগ করচে। আমার খালি পয়সাগু'লাই গেল।

নীলিমা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে বলে, ওঃ, দিনে রাতে উপভোগ করবে! ভারি মজা না? চল একটু পাহাড় দিয়ে বেড়িয়ে আসি।

মুখ হাত ধুয়ে তারা প্রথমেই রাঁচী পাহাড়ে যায়। তারপর তারা মুরাবাদী পাহাড়ে গিয়ে ওঠে। পাহাড়ের উপরে 'ঠাকুরদের' বাড়ীটা দেখে নীলিমা খুব সুখ্যাতি করে তারপর তারা পাহাড়ের উপর বসে পড়ে একটা মস্ত বড় পাথরের উপর। তখন দু'টি মেয়ে তাদের পাশেই মস্ত বড় দু'টি পাথরের উপরে হিলওলা জুতো পরে খেলা করছিল। খেলা হচ্ছে – পাথরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে লাফিয়ে যাওয়া।

এ দৃশ্য দেখে ত নীলিমা ভয়েই আকুল, বলে, বল নাগো ওদের, ওরা আর যেন অমন না করে। এখনি যদি পড়ে যায় ত ওদের কি আর গুঁড়ো থাকবে! তার উপর হিলওলা জুতো পরে, এখুনি ত পিছলে যেতে পারে! সমীর বলে, বনের হরিণগুলো জান, পাহাড়ের, উপরে পাথরের পর পাথর বেয়ে কেমন করে এক ছুটে উঠে যায় আবার নেমে আসে? সেইটেই তাদের আনন্দ, সেইটেই তাদের খেলা। তাদের তাতে মরণ হয় না, পা পেছলায়না। তাদের পায়ে জুতোর চেয়েও শক্ত খুর আছে।

বিকেলে একবার জগন্নাথ পাহাড় ঘুরে এসে সমীর ও নীলিমা বারান্দায় বসে বসে রাস্তায় রাঁচীর লোকদের বৈশিষ্ট দেখত। হোটেলের পাশেই ছিল এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দুর্গোৎসব-বাড়ী। কত লোক

আসত-যেত সেই প্রতিমা দর্শনে। সেও এক দেখবার জিনিষ। তাই দেখত বসে বসে সমীর আর নীলিমা সন্ধ্যার পর।

ধীরে ধীরে তাদের কেটে যায় দু'দিন। বাড়ী ফেরবার আগের দিন সমীর ও নীলিমা চোদ্দ টাকা দিয়ে একটা টেক্সি ভাড়া করে দশটার সময় খাওয়া দেওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ে ঝোনা এবং হুণ্ড্রু ফলস্ দেখতে। পুরুলিয়া রোড্ দিয়ে গাড়ী সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে ছুটে চলে। ঝোনা পাহাড়ের উপর যখন ট্যাক্সি তাদের নামিয়ে দিলে তখন বেলা দু'টো।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গিয়ে ঝোনা ফলস্ দেখে সমীর ও নীলিমা ফিরে আসে প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে কারণ এটা দেখবার তাদের তত আগ্রহ ছিল না। তারপর তারা ফিরে আসে হুণ্ড্রু ফলসে। পুরুলিয়া রোড্ থেকে তের মাইল লাল পাহাড়ের পথ বেয়ে পাহাড়ের উপর হুণ্ড্রু ফলস্ থেকে কিছু দূরে ট্যাক্সি নামিয়ে দেয় তাদের। ট্যাক্সি থেকে নেমেই তারা দেখে যে, একদল পুরুষ এবং মহিলা তাদের আগে কিছুদূরে দল বল নিয়ে চলেচে। নীলিমা ভালো করে' দেখে বলে, দেখ দেখ, বোধ হয় ওরা ফিল্ম্ তুলতে এসেচে, চল আমরা দেখিগে কেমন করে ফিল্ম্ তোলে। সুতরাং সমীর এবং নীলিমা তাদের ধরবার জন্যে একরকম ছুটেই চলে। অল্পক্ষণ মধ্যেই তারা দেখে পাহাড়ের উপরে একটা ছোট ঝরণা পেরবার জন্যে সকলে জুতো খুলছে আর বলাবলি করচে জুতো খোলবার কি দরকার আসুন না আমি কোলে করে পার করে দিই—না না আর কোলে করে পার করতে হ'বেনা আমরা নিজেরাই পেরতে পারব—তারপর হাত ধরাধরি করে সকলে পেরিয়ে পড়ে। নীলিমাও সমীরের হাত ধরে জুতো হাতে নিয়ে পেরিয়ে যায় সেই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য

ঝরণার প্রবাহ। তারা আবার চলতে থাকে। মিনিট পাঁচেক পর তাদের কানে ভেসে আসে ফলসের আওয়াজ। মিনিট পনের পরে তারা এসে উপস্থিত হয় ফলসের কাছে। সেকি বৃহৎ ফলস্! শত শত ফিট্ উঁচু থেকে প্রবল বেগে ঝর্ ঝর্ করে জল ঝরে পড়েছে। আর, কি তার আওয়াজ! জলকণায় চারিদিক কুয়াশাচ্ছন্ন। পাহাড়ের উপরের জলপ্রবাহে দু'জন সাহেব মেম লাফালাফি করে খেলা করছে।

কিছুক্ষণ উপরের শোভা দেখে সমীর ও নীলিমা নামতে থাকে পাহাড় বেয়ে, নীচে গিয়ে একবার উপরের এবং পারিপার্শ্বিক দৃশ্য দেখবার জন্যে। অনেক সাবধানে ধরাধরি করে নীলিমাকে যখন সমীর নীচে নামিয়ে নিয়ে গেল তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। পূর্ব্ববর্ণিত ফিল্ম্ পার্টি তখন নীচে থেকে উপরে ওঠবার জন্যে তোড়জোড় করচে।

নীলিমা কখনও পাহাড় বেয়ে নামার কি কষ্ট তা জানত না। সে এই পাহাড় বেয়ে নামতে একেবারে ঘেমে নেয়ে গেছল তাই মুখে একটু জল দেবার জন্যে এগিয়ে গেল ফলসের দিকে।

সমীর তাই দেখে তাকে বাধা দিয়ে বলে, কোথায় যাচ্চ নীলিমা? যেওনা। নীলিমা একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলে, বারে, কেন? একটু জল দেব মুখে তাও দিতে পাবনা। সমীর উত্তরে বলে, শেষে কি চোরাবালির মাঝে পড়ে প্রতিমার মতন প্রাণটা অগ্নি অগ্নি খোয়াবে? তার চেয়ে এই পাথরটায় এসে বস, দু'জনে খানিকক্ষণ বসে বসে গল্প করি।

সমীরের মুখে একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে নীলিমা আর কিছু বলতে সাহস করেনা, আস্তে আস্তে এসে বসে তার পাশে। প্রপাতের জলকণা উড়ে এসে লাগে তাদের গায়ে।

নীলিমা বলে, আমি মরলে তোমার এত ভাবনা কেন বল দিকিন্? এত সহজে মরবনা। আচ্ছা, প্রতিমা কেগো?

সমীর গম্ভীর হয়ে বলে, প্রতিমাকে জান না?—তখন নীলিমা বুঝতে পারে, বলে, ও, দিদির কথা বলচ? আচ্ছা, দিদির কি হয়েছিল গো? তোমরা নাকি শিকার করতে গেছল দু'জনে? আচ্ছা, তোমার এত শিকারী বলে নাম ছিল, তবে বন্দুক ছাড়লে কেন?

সমীর উদাস হয়ে বলে, শোন তবে—একদিন এম্নি দিনে আমরা দু'জনে এসে বসেছিলাম এই পাথরের উপরে। তুমি যেখানে বসেচ ঠিক ঐখানেই বসেছিল প্রতিমা, আর আমি ঠিক এইখানে। সেদিনও এম্নি জলকণা এসে লেগেছিল আমাদের গায়ে। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর প্রতিমা বায়না ধরলো যে, সামনের পাহাড়টায় সে একবার গিয়ে দেখবে। আমার তখন শিকারী বলে খ্যাতি ছিল, নিজের গর্ব্বও ছিল, তাই বন্দুক হাতে করে দু'জনে চল্লুম পাহাড় বেয়ে! হঠাৎ কোথা থেকে একটা বড় সম্বার এসে শিং দিয়ে আঘাত করে ফেলে দিলে প্রতিমাকে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে। সোনার প্রতিমা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে হরিণ কোথায় মিলিয়ে গেল। হাতের বন্দুক হাতেই রয়ে গেল। প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে বাড়ী ফিরলাম। পরদিন লোকজন নিয়ে এসে হাজির সম্বার মারবার জন্যে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খুঁজেও দেখা মিলল না একটারও। শেষে বিফলমনোরথ হয়ে বসে আছি, এমন সময় এসে খবর দিল একজন। ঘোড়া তুলে যেম্নি ফায়ার করতে যাব, দেখি —একটা আর একটার গা চাটচে। আর মারা হ'লনা। ওরা যে এক জোড়া—স্বামী স্ত্রী।

নারী

—বাবারে বাবা, এ বাড়ীতে আবার মানুষে বাস করে, যেন দম বন্ধ হয়ে গেল। পোড়া ধোঁয়াও কি বেরুতে চায় না, যেন কুণ্ডুলি পাকাচ্চে। উঃ, চোখ চাইবার যো নেই, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ওমা শান্তি, দে না মা দরজা জানলাগুলো বন্ধ করে। এখুনি ধোঁয়া ঢুকে সব নষ্ট করে দেবে! কি কপাল করেই জন্মেছিলুম!—উনানে ধোঁয়া দিয়াই প্রমীলা চিৎকার করিয়া ওঠে। উনানও বিষ উদ্গার করিতে করিতে ধরিতে থাকে। প্রমীলা কতকগুলি বাসন লইয়া আসিয়া কলতলায় মাজিতে বসে। সামান্য কয়টি বাসন মাজিতে তাহার বিলম্ব হয় না। কলের মুখে মাজা বাসন রাখিয়া সে কল খুলিয়া দেয়। কলের জল যেন আর পড়িতে চায় না—খেঁজুর গাছের রসের মত চুয়াইয়া চুয়াইয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়িতে থাকে। প্রমীলার মাথায় আগুন জ্বলিয়া ওঠে। সে কলের মাথা মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। তারপর চিৎকার করিয়া বলে—ওগো, একটু কলটা দাও না গো?

ঠিক অনুরূপ গম্ভীর কণ্ঠেই উত্তর আসে, যা দিয়েচি খুব দিয়েচি। ওর বেশী জল আর সকাল বেলায় সকলের কাজের সময় পাবে না।

প্রমীলা জানলার কাছে দৌড়াইয়া আসিয়া গর্জ্জিয়া বলে, পাবে না মানে? আমরা ভাড়া দিই না? এই ত সাতটা বাজল। তোমাদের জন্যে কি সেই রাত্রে উঠে কাজ করতে হ'বে নাকি?

অপর কল হইতে উত্তর আসে, তা আমরা কি জানি বাপু? রাত্রে উঠে, কি সকালে উঠে, কাজ সারতে হ'বে তা আমরা কি জানি?

উপায় না দেখিয়া প্রমীলা একেবারে দুপ্‌ দাপ্‌ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া যায়। তাহার পর স্বামী অজিতকে লক্ষ্য করিয়া বলে, কি করে এ বাড়ীতে বাস করব? না আছে জল, না আছে আলো, না আছে বাতাস। ধোঁয়া দিলে দম বন্ধ হয়ে আসে, তবু এ বাড়ী ছাড়বে না? কে কবে কি বলে গেছে যার কথা অতীতের স্বপ্ন তার জন্যে এত? আর আমি যে একটা মানুষ খেটে খেটে মরচি, এত করচি তা আমার কথা কি কথা নয়? দেখ দিকিন, সকাল বেলায় কাজের সময় একটু যদি জল না পাওয়া যায় ত' কি করতে ইচ্ছে হয়? মাথা মুড় খুঁড়তে ইচ্ছে হয় না কি? মেয়ে ছেলেরা যদি কাজের সময় জল না পায় ত তৃষ্ণার জলের অভাবের চেয়েও তাদের বুক ফেটে যায়। তা কি তুমি বুঝবে? হায়রে আমার কপাল, তা নইলে আমার এত খোয়ার হ'বে কেন? না ওরা ঐ রকম মুখের উপর জবাব দিতে পারত!

অজিত গম্ভীর হইয়া নিস্তব্ধে সব শুনিয়া যায়। এরূপ অভাব অভিযোগ প্রত্যহই সহস্রবার লাগিয়া আছে। ইহাতে মনোনিবেশ করিতে হইলে তাহাকে এতদিন পাগল সাজিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। স্ত্রীলোকের স্বভাব ধর্ম্মই এই ভাবিয়া অনেক সময় অজিত চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু সময় সময় উত্তর না দিলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া

যাইবে—ভদ্রলোকের বাড়ী কি বস্তী তাহা প্রভেদ করিবার উপায় থাকিবে না, তাই মান সম্মান বাঁচাইবার জন্য সে উত্তর দেয়, তা আর একটু সকালে কাজগুলো করে ফেলতে পার না? এখন এই সময় সকলে একসঙ্গে লাগলে এ রকম ত হবেই। রোজ রোজ কল নিয়ে এ রকম ঝগড়া ঝাঁটি করলে কি হবে?

প্রমীলা রাগে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে—তা বলবে বই কি। তা নইলে আর আমার এ রকম দুর্দ্দশা হ'বে কেন। সোয়ামী যদি সে রকম হ'ত তা হ'লে কি আর শেয়াল কুকুরে লাথি মারতে পারত? আমি ত' আর দাসী বাঁদী বইত' কিছু না। আমার সুখ দুঃখ বুঝবে কেন? আমি ত' তার মত কোনদিনই রাজরাণী হ'তে পারলুম না, চিরকাল চাকরাণী হয়েই জীবনটা কাটাতে হ'ল। দ্বিতীয় পক্ষের বউ হওয়ার চেয়ে আর পাপের ভোগ আছে। খেঁতলানী খেতে খেতেই জীবনটা গেল। দ্বিতীয় পক্ষের বউ হওয়ার চেয়ে সতীন নিয়ে ঘর করা ভাল। মরণটাও ত' হয় না। মরণটা হলে আমিও বাঁচি আর পাঁচ-জনেরও হাড় জুড়োয়।—বলিতে বলিতে প্রমীলা নীচে নামিয়া যাইয়া বাসন ধুইতে থাকে।

সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। রাস্তা দিয়া কত ফেরীওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছে। শান্তি উপরে বসিয়া তাহার পিতার ঘরে খেলা করিতেছিল। হঠাৎ লীচুওয়ালা 'লীচুফল' বলিয়া হাঁক দিতেই সে ছুটিয়া নীচে নামিয়া যায়।

—ও লীচুওলা দাঁড়াও। বাবার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আসি—বলিয়া ছুটিয়া উপরে তাহার বাবার কাছে যায়। বলে, বাবা, একটা পয়সা দাও না! লীচু কিনব।

অজিত বুঝাইয়া বলে, দেখ, ও লীচু ভাল নয়। আমি বাজার থেকে ভাল লীচু এনে দোব। ও টক লিচু খেলে অসুখ করবে। যাও, ও লিচু কিনতে হবে না!

ভয়ে ভয়ে শান্তি নীচে নামিয়া আসে। তাহার আর পিতার কাছে কথা কহিবার সাহস হয় না। কিন্তু লিচু খাইতেই হইবে। সে তাহার মাকে যাইয়া ধরে।

প্রমীলা রাগিয়া অভিমানভরে বলে, দেখ মা, আব্দার রাখ।

মাতাকে কোন মেয়েই ভয় করে না, তাই সে তাহার আঁচল ধরিয়া আব্দার করিয়া আবার বলে, না আমি খাব। পয়সা দাও না, লিচওলা দাঁড়িয়ে রয়েচে যে!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ মা একেবারে খাইয়ে দোব। আমারই কত খোয়ার তা তোমার! তার পেটের একটা থাকত ত' দেখতে কত আদর যত্ন হ'ত! আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল কত সব আসত। তুমি যেমন গর্ভে এসে জন্মেছ, তোমার মরণই ভাল। তোমার লিচু খেয়ে আর দরকার নেই। তুমি মর, মর।

মাতার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া শান্তির এইবার ভয় হয়। সে কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায় উপরে চলিয়া যায়। লিচুওয়ালা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মনে মনে অভিযোগ করিতে করিতে 'লীচু ফল' 'লীচু ফল' বলিয়া হাঁকিতে হাঁকিতে চলিয়া যায়।

অজিতের অফিসের সময় হইয়া আসে। সে খাইতে নীচে নামে। তাচ্ছিল্যভরে রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে আজ প্রমীলা তাহাকে

পরিবেশন করিতে থাকে। অজিত সব বুঝিতে পারে, ইহা তাহার সহিয়া গিয়াছে।

অজিত অফিস যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া প্রত্যহের মতই প্রমীলাকে আজও আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, আজ কি আনতে হ'বে?

প্রমীলা একটু গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিয়া মুখ ভার করিয়া উত্তর দেয়, কিছু না।

ইত্যবসরে শান্তি মায়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জানে এই সময় মা বাবাকে যাহা আনিতে বলে, বাবা সন্ধ্যার সময় অফিসের ফেরত সব প্রত্যহই লইয়া আসে। কোনদিন কিছুরই ব্যতিক্রম হয় না। তাই সে মার কাণের কাছে মুখ লইয়া যাইয়া বলে, মা, বাবাকে লিচু আনতে বল না।

মা ধমক দিয়া উঠে, আর লিচু খায় না। লিচু খাবার কপাল করে এসেছ কিনা?

অজিত ব্যাপার বুঝিতে পারে! প্রথমে সকালে কল লইয়া হইয়া গিয়াছে। তাহার পর লিচু লইয়াই যত গোলযোগ। অজিত ভাবিতে থাকে—ভালর দিকটা কি প্রমীলা কোনদিনই লইতে পারিল না! দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহই কি তাহার জীবনকে অভিশপ্ত করিয়া তুলিয়াছে? কথায় কথায় তাহারই কথা আনিয়া সে তাহাকে কষ্ট দেয়। সেই কি ওর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে? যাহার পৃথিবীতে অস্তিত্ব নাই সে কেমন করিয়া শত্রু হয়! সে ত জানে যে, সে প্রমীলাকে কত ভালবাসে, কিন্তু সে যদি সন্দিগ্ধ মন লইয়া তাহা উপভোগ করিতে না পারে তবে সে কি করিতে পারে?—তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সে প্রমীলার

কথায় রাগে, দুঃখে, অধৈর্য্য হইয়া পড়ে। তাই বলে, দেখ প্রমীলা, দিন দিন তোমার কাণ্ড কারখানা আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।

কড়ায় খুন্তি দিতে দিতে মুখ ঘুরাইয়া খুন্তিশুদ্ধ হাত কোমরে রাখিয়া প্রমীলা বলিয়া ওঠে, আমার ইয়ে ত অসহ্য হবেই। একি প্রথম পক্ষের যে—?

—দেখ তোমার বড় ইয়ে হয়েচে। তুমি সব কথাতেই তাকে টেনে আন কেন বলত? সে কি করল? নিজের এই ভুলের জন্যেই ত নিজে জ্বলে পুড়ে মর।

—হ্যাঁ, নিজের ভুল বই কি? কবে সে বলে গেছে যে এ বাড়ী বদল কোর না। তা এখনও এত কষ্টতেও আমার এত অনুরোধেও বাড়ী বদলান হ'ল না। আবার নিজের ভুল। এমন চাক্ষুস প্রমাণ থাকতেও ভুল? আমি ত' কুকুর সেজে আছি। ইচ্ছে হ'লে দয়া হ'লে একবার ডাকলে। কুকুর অমি লেজ নেড়ে কাছে গেল, মনে করলে কত ভালই না বাসবে। তাড়িয়ে দেবার ই'চ্ছ হ'ল ত' তখনি দুর দুর করে তাড়িয়ে দিলে। তার একটু আব্দারও সহ্য হয় না, ভয় হয় পাছে গায়ে আঁচড় লাগে!—প্রমীলা দুঃখে কাঁদিয়া ফেলে।

সেই অবস্থাতেই অজিত অফিসের উদ্দেশে রওনা হইয়া পড়ে। আর তাহার এ অভিনয় ভাল লাগে না। প্রথম প্রথম প্রমীলাকে রাগাইতে বড় আমোদ লাগিত। এখন মনে হয় অভিনয় সত্যে রূপান্তরিত হইতেছে। তাই সারাদিন সে ভাবে—যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়াছে। আর না! মেয়ে মানুষের কি সন্দিগ্ধ মন!. একটা অসার, অলীক বস্তুকে কল্পনায় লইয়া কতগুলি জীবন, কত সংসার তাহারা নষ্ট করিতে পারে! আর কত

বাঙ্গালীর সংসার এই মেয়েগুলির ভ্রান্ত ধারণার জন্যই না স্বর্গ হইতে নরকে পতিত হইতেছে। এক জনের স্মৃতি রাখিয়া আর একজনের মনে কষ্ট দেওয়া যে পাপ তাহা সকলেই জানে। স্ত্রীর উপর কোন বুদ্ধিমান স্বামীই কি এত বড় অবিচার করিতে পারে ?

অফিস হইতে বাহির হইয়াই সে প্রথমে লিচু কেনে, তাহার পর গরম গরম পাঁঠার মাংসের সিঙ্গাড়া, চানাচুর, শোনপাপড়ি ইত্যাদি প্রমীলা যাহা যাহা খাইতে ভালবাসে কিছুই কিনিতে বাদ দেয় না। কয়দিন ধরিয়া প্রমীলা একটা ভাল কাপড় আনিবার জন্য বলিতেছে তাহাও সে কিনিতে ভুলে না, সঙ্গে সঙ্গে 'কানন বালা' পেটেন্টের একটা ব্লাউজও।

সব লইয়া অজিত যখন বাড়ী ফিরিল তখন রাত্রি প্রায় আটটা বাজে, দেখে সব ঘর নিস্তব্ধ। প্রত্যহ প্রমীলা যেখানে পা ছড়াইয়া বসিয়া অপেক্ষা করে সেখানেও সে নাই। মেয়েটাও ছুটিয়া আসিল না। অজিত অবাক হইয়া যায়।

অজিত বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলে প্রমীলার মনে নানা কথার উদয় হইতে থাকে। সে কেমন ছিল, নিশ্চয় তাহাপেক্ষা সুন্দরী, নিশ্চয় স্বামীর মন ভুলাইবার, তাহার ভালবাসা পাইবার উপায় তাহার খুব জানা ছিল। তাহা না হইলে আজ কত বৎসর হইল সে মরিয়া গিয়াছে, আজিও স্বামী তাহাকে যা ভালবাসে তাহার এক অংশও তাহাকে বাসে না। প্রমীলা ভাবে আর জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে থাকে। সে না খাইয়া উপরের ঘরে যাইয়া অজিতের বাক্স, পোর্টম্যান সব খুলিতে আরম্ভ করে। একে একে তন্ন তন্ন করিয়া সে সব খুঁজিতে থাকে। আশা, যদি পূর্ব্ব স্ত্রীর

কোন স্মৃতি-চিহ্ন পাওয়া যায়! অনেক সন্ধানের পর কত দিনের পুরাতন বিমলিন একটি ফটো বাহির হইয়া পড়ে। প্রমীলা একবার সেইটি দেখে আর একবার সামনে আরসীতে তাহার নিজের চেহারা দেখে। কিছুই সে ধরিতে পারে না। তাহার মনে হয়, সে এক ছেলের মা হইলেও তাহার অপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী। তবে কি করিয়া সে স্বামীকে এত বশ করিয়াছিল? তাহার দেখিতে ভুল হয় নাইত? নিজের রূপ সে ভাল করিয়া ধরিতে পরিতেছে না কি? সে ত' কোন মন্ত্র জানিলেও জানিতে পারে!—সে আবার খুঁজিতে আরম্ভ করে! হঠাৎ একটা বইয়ের পাতায় মেয়েলী হাতের লেখা কয়টি কথা তাহার চোখে পড়ে—

নরের গলে নারীর মালা
অজিত বাবুর শৈলবালা।

প্রমীলা ঈর্ষায় মরিয়া যায়। শৈলবালা কাটিয়া প্রমীলা বালা করিয়া দেয়। তাহার পর সে প্রতিজ্ঞা করে যে, আজ আর সে রাঁধিবে না, খাইবে না। আপিস হইতে সে আসিয়া খাইতে না পায় ত' তাহার কি? সে যখন তাহাকে অমন করিয়া কাঁদাইতে পারে তখন তাহার জন্য অত কষ্ট করা কেন? বৈকাল কাটিয়া যায়। সন্ধ্যা হইয়া আসে। তবু প্রমীলার রাগ পড়িল না। সে আজ আর অজিতের ঘরে বিছানা করিবে না। একেবারে অপর এক ঘরে যাইয়া মেয়েকে ঘুম পাড়াইয়া মেঝের আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়ে।

অজিত আসিয়া এঘর ওঘর করিয়া তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। সে জামাটা খুলিয়া আলনায় ফেলিয়া দিয়া প্রমীলাকে সোহাগ করিয়া ডাকিল, শুনছ? এই শুনছ?

প্রমীলা একবার, উঃ, করিয়া আবার পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। সারাদিনের উত্তেজনায়, ক্লান্তিতে তাহার চোখ জুড়িয়াছিল। অজিত একটি কাঠি তাহার কানের মধ্যে দিয়া ঘুরাইতে থাকে, তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সম্মুখে অজিতকে দেখিয়া সে দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, বলে, যাও!

সে আবার পাশ ফিরিয়া চোখ বুজে।

অজিত দুই হাত দিয়া তাহার শরীরটাকে ঘুরাইয়া ধরিয়া আবার বলে, দেখ প্রমীলা, শোন, আজ কত কি...।

কথা শেষ হয় না। প্রমীলা গর্জ্জিয়া উঠে, আর সোহাগে কাজ নেই।

—সোহাগ নয় প্রমীলা। আজ...।

—আজ কি? আজ ত এই ক' বছর ধরেই সোহাগ দেখছি—কেবল দরকারের সময়। আর কত দিন দেখব?

—শোন। অন্য দিনের কথা ভুলে যাও। আজ তোমার পরীক্ষা শেষ! আজ তোমায়...।

—আজ কি? আজ আবার নতুন করে বিয়ে হবে বুঝি? রাগের কথা ভুলে যাব? এটা কি?—প্রমীলা কাপড়ের ভিতর হইতে ফটো বাহির করিয়া দেখায়। তাহার পর রাগে ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসে।

অজিতও তাহার পাশে বসিয়া পড়ে। বলে, তা এটাকে কি করতে হবে বল? পুড়িয়ে ফেলতে হবে?

প্রমীলা চুপ করিয়া থাকে।

—কেন পুড়িয়ে ফেলব? অজিত প্রশ্ন করে।

—ও আমার শত্রু।

—দাও, দেশলাই দাও।

প্রমীলা দেশলাই আগাইয়া দেয়।

একজনের শেষ স্মৃতি মুহূর্ত্ত মধ্যে ধোঁয়া হইয়া চিরতরে শূন্যে মিশিয়া যায়। স্বামী স্ত্রী দুই জনে এক দৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া থাকে। তাহাদের মুখে হাসি ফুটিয়া ওঠে। আজ যে পরীক্ষা শেষ।

এইবার অজিত প্রমীলাকে গাঢ় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া বলে, বাড়ী বদল করতে সে বলেনি, সব মিথ্যে। তোমায় কি আমি কোনদিন বলেছিলুম যে, সে একথা বলেছে? তোমার ধারণা অমূলক। আমি এতদিন তোমার মনের অবস্থা দেখছিলুম, কিন্তু আর চল্ল না। সেটা বলেছিলেন মা, কারণ এই বাড়ী থেকেই আমার চাকরী হয় কিনা তাই। হায় রে তোমাদের সন্দিগ্ধ মন! এইবার হ'ল ত? একবার যাকে পুড়িয়ে এসেচি তাকে আবার নিজে হাতে হাসিমুখে তোমার সামনেই পোড়ালুম। এইবার বিশ্বাস হ'ল ত?

প্রমীলা অজিতের মুখটি তাহার কোমল, সুবাসিত, নরম হাত দুইটি দিয়া তাহার মুখের দিকে ফিরাইয়া ধরে। পরে অভিভূতের মত বলিয়া ওঠে, সত্যি! আঃ, দেখ, দেখ, এইবার আমার মুখটা একবার ভাল করে চেয়ে দেখ, লক্ষ্মীটি!

অজিত একদৃষ্টে প্রমীলার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। প্রমীলা আবার জিজ্ঞাসা করে, কি দেখছ বল? চুপ করে রইলে যে?

—কি দেখছি? দেখছি, বর্ষার ঘনীভূত মেঘ সরে গিয়ে বসন্তের নির্ম্মল আকাশের প্রতিচ্ছবি তোমার ঐ মুখে! বড় তৃপ্তি আর সুষমা মাখা ও মুখ।

প্রমীলা আনন্দে আটখানা হইয়া যায়। কত দিন যে সে এরূপ হাসি হাসে নাই! তাহার পর অজিতের গাল দুইটি ধরিয়া নাড়া দিয়া বলে, কি, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলে যে বড়? আজ আর ভাবুক, কবি হয়ে থাকতে দিচ্ছি না। শোনো—

জুয়েলারী সপ

রোজ খেচাখেচি—বসে বসে খাচ্ছে আর ঘুরে বেড়াচ্চে। বাবা উত্তেজিত হয়ে বলেন, আমি চোখ বুজলে যে চোখের সামনে খালি গোল গোল হলদে জিনিষ দেখবি, সরষে ফুল, সরষে ফুল! লেখাপড়া শিখলে না, এখনও টাকাকড়ি উপায় করবার ক্ষমতা হ'ল না, সাতশ আঠাশ বছর বয়স হ'ল খালি সিনেমা, কোঁচা দোলানো আর আড্ডা! আরে আমি মরলে যে তখন আধ হাতের বেশী কোঁচা হবে না। বাবার ত এই রূঢ় মন্তব্য। মা খাবার সময় স্নেহের সুরে বুঝিয়ে বলেন, দেখ, বাবা সুশান্ত বয়স ত হ'ল, অনেকদিন ফ্যূর্ত্তি করেও নষ্ট করলি, আর কেন? এইবার যা হয় একটা কর। বয়স ত হ'ল উনি আর কতদিন সংসার চালাবেন। তোদের যেমন ছেলে বেলায় আমরা মানুষ করেছি, আমাদের ইচ্ছে যে বুড়ো বয়সে তোরাও আমাদের ঠিক তেম্নি অসহায় বালকের মতই লালন পালন কর!

বাবার কথা রূঢ় ঠেকে মনে হয়, বাবা অন্যায় বলছেন তাই মনে মনে রেগে দু'কথা শুনিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকলেও তা মুখ দিয়ে বেরোয় না, চুপ করে থাকি। কিন্তু মা যখন স্নেহ করে বলেন তখন মনটা দমে যায়—মনে হয় মা ত ঠিক কথাই বলচেন। তারপর আজকাল বয়সের সঙ্গে

সঙ্গে পয়সারও দরকার হয়ে পড়েচে। সিনেমা, কাপড় জামা, রেষ্টুরেণ্ট ইত্যাদিতে বেশ দু'পয়সার দরকার। মার কাছে কত সিনেমার এবং বাবার কাছে কাঁহাতক আর পোষাকের খরচ চাওয়া যায়! তাই এখন পয়সা উপায় করবার স্পৃহাও একটু একটু হয়েছে; তার উপর বাবার রূঢ় বাক্য, মার স্নেহের আদেশ কি উপেক্ষা করা যায়? মাকে একদিন বল্লুম, আচ্ছা মা, তোমরা যে উপায় করতে বল। আচ্ছা, বলদিকিন কি করা যায়? লেখা পড়া শিখিনি, চাকরী ত পাবার কোন আশা নেই।

মা বলেন, তা ত বটে, কত চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তুই ত আর লেখাপড়া শিখ্‌লি না, তা যা হবার হয়ে গেছে একটা ব্যবসা কর না।

আমি বিস্মিত হয়ে বলি, বল কি? কত ধুরন্ধর ফেল হয়ে যাচ্ছে, আমি ত কোন ছার! তাদের দোকান দেখলে তুমি ভাবতেও পারবে না যে এ দোকান ফেল হতে পারে, দশ বিশ লাখ টাকার মাল. তাদের। যা কম্পিটিশনের বাজার, এতে কি ব্যবসা করা সোজা, তারপর আমি ব্যবসার জানি কি? আর টাকা দেবে কে?

আমার কথা শুনে মা কি ভাবেন তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করে বলেন, তা যা হয় হবে। দু'দিন দেখলেই সব শিখে যাবি। আর টাকা? তা উনি পাঁচশ দেবেন বলেছেন আর আমি না হয় আমার যা কিছু আছে কুড়িয়ে বাড়িয়ে শ' তিনেক টাকা দিতে পারি। তারপর কপালে থাকে দেখবি এই থেকেই তুই লক্ষপতি হয়ে যাবি।

মার সব কথা শুনে মনে শক্তি এল; স্থির করলাম, একটা ব্যবসা

করতেই হবে। এখন মহা বিপদ—কি ব্যবসা করা যায়! একবার ভাবলাম, একটা ষ্টেশনারী দোকান করা যাক আবার ভাবলাম, না এ হাজার জিনিষের দোকান না করাই ভাল। একটা খুব চলতি দু'দশ রকম জিনিষের দোকান করতে হবে। অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম যে, আজকাল মেয়েরা খুব নতুন ডিজাইনের গয়না পরছে। একটা 'জুয়েলারী সপ্' খোলা যাক্ আর তাতে রাখা হবে কেবল নতুন নতুন ডিজাইনের মাল। একটা ভাল ঘর দেখে আমার সাধের 'জুয়েলারী সপ্' একদিন খুলে বসলাম। দেখি কত নতুন দোকানদার আমাকে একটা নতুন জীব ভেবে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। দ্বিতীয় দিনে আশপাশের সব দোকানদার এল এই নতুন জীবটিকে দেখবার জন্যে। কেউ জিজ্ঞেস করলে, মশায়, কত ভাড়া হ'ল? কেউ বল্লে, মশায়ের পূর্ব্বে কোথায় দোকান ছিল, ইত্যাদি। কত লোক এল এবং কত কথাই না জিজ্ঞেস করলে; শেষে এমন হয়ে দাঁড়াল যে: তাদের জ্বালায় উদ্‌ব্যস্ত হয়ে উঠলুম।

দিনের পর দিন কেটে যায়। একটা খদ্দেরও দোকানে ওঠে না। মনে করলুম নতুন দোকান দু'চার দিন যাক তারপর খদ্দের নিশ্চয় উঠবে। আমার আশা বিফল হয়নি। একদিন দোকান খুলছি এমন সময় এক বৃদ্ধ মহাশয় ব্যক্তি এসে বল্লেন, হ্যাঁ ভাই, ছোট ছেলেদের রূপোর ঝুমঝুমি আছে? বেশ গম্ভীর ভাবেই উত্তর দিলাম, হুঁ। তারপর অনেক করে নতুন খদ্দেরকে ত বিক্রি করলাম, লাভ হ'ল নগদ দু'আনা, তাতেই নিতে চায় না। এম্নি করে দু'মাসের মধ্যে দোকান এক রকম চলতে লাগল। খরচটাও উঠতে লাগল। তখন মনে হ'ল, যদি দু'পয়সা আয়ই না হ'ল ত

এ ভূতের বেগার খেটে কি লাভ? ঠিক করলুম, আর ছ'মাস দেখব তারপর দোকান নিশ্চয়ই তুলে দেবো। হ'বার মধ্যে হ'বে যে, মা বাবা দু'জনেই ডুববে। পিতার আজ্ঞায় পশুরাম মাকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় নি। আমি না হয় মাতৃ আজ্ঞায় বাবাকে ডুবাব তাতে এমন আর কি হয়েছে! নানা রকম দুশ্চিন্তার মধ্যে আরও দু'মাস কেটে গেল। ভগবানের কৃপায় কি আমার দোকানদারীর কায়দায় জানি না বেশ দু'চারটে খদ্দের হতে লাগল। তখন মনে হ'ল, কত ভদ্রমহিলা সামনের পাশের দোকানে ওঠে আমার দোকানে ত কেউ ফিরেও চায় না। মনে হ'ল দোকানে মাল নেই বলে কেউ আসে না, তাই এক আত্মীয়ের কাছে শ' তিনেক টাকা ধার করে দোকানে ফেল্লাম কিন্তু কই কিছুই ত না। মনে ধিক্কার এল, পরের দিন দোকান তুলে দোব কৃতনিশ্চয় হয়ে একদিন দোকান বন্ধ করচি আর পাগলের মত আবোল তাবোল ভাবচি এমন সময় ক্ষীণ কণ্ঠে কে যেন আমার কানের কাছে বল্লে, শুনচেন?

আমি স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে দেখি একটি ভদ্রমহিলা! সবিনয়ে বল্লাম, কি খুঁজচেন? মহিলাটি আরও বিনীত সুরে বল্লেন, যদি আপনি বিরক্ত না হন ত বলি কারণ আপনার দোকান বন্ধ করবার সময় এখন আপনাকে বিরক্ত করা উচিত বলে মনে করি না।

আমি দোকানের কপাট পুনরায় খুলে দিয়ে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বসতে অনুরোধ করে বল্লাম, না বিরক্ত আর কি।

মহিলাটি একটু গম্ভীর হয়ে বল্লেন, এখন ক্ষিধের সময় কিনা। অনেক সময় এ রকম অবস্থায় দোকানদারের কাছে সুফল পাওয়া যায় না। যাক, আপনার ব্যবহার ঠিক সাহেবপাড়ার দোকানদারদের মতন। আমি

এই ডিলিংসটাই খুব বড় বলে মনে করি। তা আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না, কাল সকালে আমি আসব। আপনি কখন দোকান খোলেন বলুন ত?

আমি আমতা আমতা করে বল্লাম, সেটা আপনাদেরই উপর বিশেষ করে নির্ভর করে। আপনি যদি বলেন, ভোর ছ'টার সময় আসব, আমাকে তাহ'লে পাঁচটার সময় থেকে দোকান খুলে বসে থাকতে হবে।

মহিলাটি একটু অপ্রতিভ হয়ে বল্লেন, না না, তা নয়। আপনি জেনারলি ক'টার সময় দোকান খোলেন? আমি বল্লাম, এই দশটা নাগাদ।

মহিলাটি হেসে নেমে যেতে যেতে বল্লেন, আচ্ছা, বেশ ভাল কথা, সেই ভাল, আমি কলেজে যাবার সময় আপনার কাছে হয়ে যাব। নমস্কার।

নূতন মহিলা-খদ্দের পেয়ে দোকান বন্ধ করে মনের আনন্দে বাড়ী ফিরলুম। ভাবলুম, মেয়েরাই ত কার্টসি জানে, কেমন ভদ্রভাবে কথা কয়, সাধে কি আমি লেডি খদ্দের বেশী পছন্দ করি, কেবল ঐ জন্য। পুরুষগুলো একেবারে অভদ্র, একটু সভ্যতা কাকে বলে জানে না। জিনিষ কিনতে এল ত মাথা কিনেই নিলেন। কড়া মেজাজে—অমুকটা আছে? আরে বাপু তুই টাকা দিবি আমি পরিবর্ত্তে জিনিষ দোব তার আবার অত মেজাজ কিসের? এরাই আবার ভদ্রতার গর্ব্ব করে। হায়রে অন্ধ পুরুষ তোদের দোষ রাখবার জায়গা যে পৃথিবীতে নেই!

পরের দিন আটটা থেকে দোকান খুলে বসেছিলুম, কিন্তু প্রতীক্ষাই হ'ল সার। কোথায় সেই মহিলা। প্রথম লেডি খদ্দের শিকার করতে

না পেরে জীবনে আরও ধিক্কার ধরে গেল। ভাবলুম, বোধ হয় দোকান-দারীতে কিছু ভুলে হয়েছে তাই খদ্দেরটা হাতছাড়া হয়ে গেল। যখন দোকানদারীই এ পর্য্যন্ত করতে শিখলাম না তখন আর দোকান করে কি হবে এই কথা ভাবছি এমন সময় দেখি দেওয়ালে বড় বড় প্লাকার্ড মারচে— বিরাট শিল্প প্রদর্শনী।' মনটা নেচে উঠল একটা ষ্টল করতে হ'বে ভেবে। একদিন প্ল্যান দেখে একটা ষ্টল করবার বন্দোবস্ত করে এলাম এখানে আমার ষ্টল করবার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্চে, লেডি খদ্দেরদের পাকড়াও করা। শুনেচি এবং দেখেচি যে, লেডিরা প্রদর্শনীতে গিয়ে অনেক জিনিষ কেনে।

যেদিন প্রদর্শনীর উদ্বোধন হ'ল সেদিন আমার কি আনন্দ! কত সব বড় বড় দোকান করেচে আমিও তার মাঝে একখানা করে বসেছি। এত দিন ধরে খদ্দের এলে কি ভাবে এবং ভঙ্গীতে তাদের জপাতে হ'বে তাই অভিনেতাদের মতন দিন রাত নিজে নিজে অভ্যাস করেচি। আজ সেই অভিনয় করতে পাব ভেবে এবং আনন্দে মন উতলা হয়ে উঠল। আশে পাশের দোকান লোকে ভরে গেল, কিন্তু আমার দোকানে আর কেউ ঢোকে না।

দোকানের বাইরে, এসে দাঁড়াতেই দেখি. পাশের দোকান থেকে এক মহিলা বেরুচ্চেন—তাঁর সঙ্গে একটি আট দশ বছরের ছেলে। আমি ছেলেটিকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডেকে বল্লাম. ও খোকা, এখানে দেখে যাও না? ছেলেটি আমার দোকানে আসতে উদ্যত হ'তেই তাকে টান দিয়ে মহিলাটি বল্লেন, কোথায় যাচ্ছিস? এদিকে আয়। ও দোকানে কি আছে?

ছেলেটি কিন্তু ছাড়ল না। আমার দোকান দেখবার তার বড় ঝোঁক হয়েছে। মহিলাটিকে দেখেই আমি অবাক। তিনি বল্লেন, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে যেন।

আমি বল্লাম, হ'বে। বোধহয় আমার দোকানে কোন দিন গিয়ে থাক্‌বেন।

মহিলাটি বিস্মিত হয়ে বল্লেন, আপনার দোকান কোথায় বলুন ত?

আমি একটি কার্ড বার করে তাঁকে দিলাম। কার্ড দেখেই তিনি বল্লেন, ও হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি সেদিন আপনার দোকানে গেছলুম বটে। তবে আমাকে এক্সকিউজ করবেন। আমার সেদিনকার কথা না রাখতে পারার অপরাধ আপনি ক্ষমা করবেন। বোর্ডিং এ ফিরে এক চিঠি পেয়ে আমাকে বোর্ডিং ছেড়ে পরের দিনই মামার বাড়ী রওনা হ'তে হ'ল। আপনার সঙ্গে আর দেখা করা হয়ে উঠল না। যাক্, আপনাকে আজ অযাচিত ভাবে পেয়ে গেলাম।

আমি আনন্দিত হয়ে হেসে বল্লাম, বেশ বেশ, তাতে কি হয়েচে তা আজকে বলে ফেলুন সে দিনে আপনার কি প্রয়োজন ছিল।

প্রয়োজন এমন কিছু না, একটা কানবালার দরকার ছিল।

বেশ দেখুন না, বলে দু'তিন রকম কানবালা বের করে দিলুম।

তিনি নাকসিঁটকে বল্লেন, এ ভাল না, পুরণো ডিজাইন।

আমি বল্লুম, বলেন কি? আমার এ নিজের পরিকল্পনা। বাজারে এর কেউ ধারণাই করতে পারে না। এ ডিজাইনটা চারটে ডিজাইন মিলিয়ে করা, জানেন?

মহিলাটি বল্লেন, বেশ আপনার ডিজাইন আপনার কাছেই ভাল। আর ডিজাইন নেই? ত্রিশ চল্লিশ রকম ডিজাইন থাকবে তবে ত?

আমি একটু গম্ভীর স্বরেই বল্লাম, সে সব বাজে ডিজাইন আমি রাখি না। আমার যা এই দশ বারটি ডিজাইন আছে এ একেবারে চয়সেষ্ট, যে একবার দেখবে তাকে নিতেই হ'বে।

না, তবে হ'লনা, কিছু মনে করবেন না, বলে মহিলাটি বেরিয়ে অন্য দোকানে গিয়ে ঢুকলেন।

এবারও খদ্দের হাত হল না ভেবে মাথা খারাপ হয়ে গেল। সেদিন আর কিছু বিক্রি করতে পারিনি। পরের দিন ষ্টল খুলে হতাশ হয়ে বসে আছি, ভাবছি, এবার কেউ যেচে আসে ত আসবে আর কাউকে সেধে ডাকছি না, তাতে খদ্দের হয় ভাল, না হয় দু'চার দিন বাদে তল্পিতল্পা গুটিয়ে দেশত্যাগ। ভগবানের কৃপায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যে অযাচিত ভাবে সেই পূর্ব্ব দিনের মহিলাটি এসে হাজির। আমি আজ আর চেয়ার ছেড়ে উঠলুম না কারণ অত করে সেধে জিনিষ বিক্রী করতে পারিনি ভেবে মনে মনে একটু অভিমান হয়েছিল।

মহিলাটি এসে ঘাড় নীচু করে শো কেসের উপর চোখ দু'টি স্থির করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বল্লেন, কালকের সেটা আছে? আমি নিজেকে আর একটু চেয়ারে ছড়িয়ে দিয়ে বল্লুম, সেটা থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি? আপনার ত পছন্দ হয়নি।

তিনি বল্লেন, হ্যাঁ, পছন্দ হয়নি তবে বাড়ীতে আমার বোনকে দোব বলে ভাবিছিলুম। একবার বের করুন না?

আমি আর একটু দর বাড়াবার জন্যে বল্লুম, কাল আপনাকে ত

বলেছি যে, এ জিনিষ যে একবার দেখবে তাকে নিতেই হবে। কালই আমার সব বিক্রি হয়ে গেছে।

বলেন কি, আর একটাও নেই? দেখুন না ভেতরে যদি একটা পড়ে থাকে, বলে মহিলাটি উৎসুক হয়ে আমার ভাণ্ডারের সব জিনিষ দেখতে লাগলেন।

আমি ভাবলাম, খদ্দের এবার নিশ্চয় ধরা পড়েছে, তাই বল্লুম, আচ্ছা, দেখছি তবে কি আর আছে? থাকতেও পারে, বলে এক পেয়ার বার করে দিলুম।

মহিলাটি একটু আনন্দিত হয়েই বল্লেন. ওঃ, আপনি কি দোকানদার মশায়। রয়েচে জিনিষ তবু খদ্দেরকে দেবেন না? বেশ এইটে আমার কানে পরিয়ে দিন ত, দেখি আরসিতে কেমন দেখায়।

আমি ত শুনেই প্রমাদ গণলুম, এ বলে কি? মেয়েছেলের গায়ে হাত দিতে হবে। বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল, ঘামে গেঞ্জি ভিজে গেল। বললুম, আরসি ত রয়েচে, আপনি নিজেই পরুন না? মহিলাটি একটু অসন্তুষ্ট হওয়ার ভান করে বল্লেন, আমি পারলে কি আপনাকে বলি? একটা জিনিষ পরিয়ে লোককে দেখাতে পারেন না আপনি এইত, প্রদর্শনীতে দোকান করেছেন; একেবারে বিড়ম্বনা, কেবল বিড়ম্বনা!

নিজের মান থাকে না ভেবে হাঁপাতে হাঁপাতে জোর গলায় সাহস করে বললুম বলেন কি? দেখি, দিন দিকিন?—বলে কম্পিত হস্তে পরিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। আরসিতে একবার এদিকে, একবার ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে মহিলাটি বল্লেন, মন্দ না, চলতে পারে। তারপর

কান থেকে কানবালাটি খুলে শো কেসের কাচের উপর রেখে বল্লেন; তা কালকে সকালে আপনি এটা আর কতকগুলো প্রেজেন্টেশনের জিনিষ নিয়ে আমার এই ঠিকনায় সকাল বেলায় যাবেন, এটা হচ্ছে আমার মামার বাড়ীর ঠিকানা ; তবে আসি নমস্কার, যেন যেতে ভুলবেন না।

কানবালাটা যথাস্থানে তুলে রেখে ভাবলুম, একি খালি খেলাচ্ছে নাকি ? আমিই খেলাব বলে দোকান করলুম আর শেষ পর্য্যন্ত কিনা আমাকেই খেলতে হল। ঘেমে তখন নেয়ে উঠেছি, গায়ের সব জামা খুলে হাওয়া খেয়ে বাঁচলুম।

রাত্তিরটা কোন রকমে কাটিয়ে সকাল বেলায় চা টা খেয়ে সাতটার সময় জিনিষপত্তর নিয়ে বালিগঞ্জের উদ্দেশে বেরুলাম। ঠিকানা সঙ্গে ছিল, বাড়ী খুজে বার করতে দেরা হল না। প্রকাণ্ড ওরিয়েন্ট্যাল আর্টের বাড়ী। এখন মুস্কিল নাম জানি না, কি বলে ডাকি। বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে সাত পাঁচ ভাবছি এমন সময় এক ভোজপুরী দারোয়ান এসে হাজির। সে গম্ভীর গলায় বল্লে, কেয়া মাঙ্গতা ?

আমি বল্লুম, কৈ হ্যায় ?

সে তার প্রকাণ্ড গোঁফ নেড়ে বল্লে, সব কৈ হ্যায়।

মহামুস্কিল এখন কি বলি—বল্লুম, বাবু হ্যায় ?

সে চোখ দু'টা ঘুরিয়ে বল্লে, কোন বাবু ? ছোট্টা, না বড়া বাবু ?

এ অসভ্য জানোয়ারের প্রশ্নে আমি ত উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। কিছু বলবার ঠিক করতে না পেরে সত্যি কথাই বলার স্থির করে বল্লুম, বাবু নেহি! কাল একঠো মায়ি লোক হামারা দোকান মে গিয়া—

সে আমার কথা শুনেই খইনিতে দু'টি তালি মেরে ঠোঁটের মধ্যে

সেটাকে গুঁজে আমার দিকে আর একটু এগিয়ে এসে বল্‌লে, কেয়া? মারি লোক গিয়া, কৈ বাবু লোক উসকা সাথ মে নেই গিয়া? ভাগো হিঁয়া সে, এ কুঠি নেই হ্যায়।

আর কথা বল্‌লে অর্দ্ধচন্দ্র খেতে হবে ভেবে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলুম। ভাবলুম—এই কি কপালে ছিল!

সন্ধ্যের সময় ষ্টল খোলার ইচ্ছা ছিল না তবু ভাবলুম কি করব যাই ষ্টলে বসে বসে ভাবা যাবে এবং একটা কিছু স্থির করে ফেলতে হবে, তাই ষ্টল খুলে বসলুম। খানিক পরেই মহিলাটি এসে হাজির।

বল্‌লেন, কই গেলেন না?

আমি বেশ স্থির ভাবেই উত্তর দিলুম, না আজ আর যাবার সময় হয়ে উঠল না। আরও ক'জন খদ্দেরের বাড়ী যেতে আমার আর সময় হ'ল না, তা আপনিই নিয়ে যান না?

আমি নিয়ে যাব? আপনি যেতে পারলেন না? আপনার দ্বারা দোকানদারী চলবে না, বলে রেগে যেই বেরিয়ে যাবেন অমনি একটা কিসে হোঁচট খেয়ে ভূলুণ্ঠিতা। আমি তাড়াতাড়ি ধরে তুলে মাথায় একটু জল দিলুম। তিনি বল্‌লেন, আমায় দয়া করে আপনাকে আমার বাড়ীতে একটা ট্যাক্সি করে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে, আমার বড় মাথা ঘুরচে।

মহিলাটি আমার কাঁধে ভর করে প্রদর্শনীর বাইরে এসে একটা ট্যাক্সিতে চড়লেন, আমিও উঠে পাশে বসলাম। ট্যাক্সি খানিকদূর আসতে না আসতেই, আমার মাথা কেমন করচে, বলে আমার কোলের উপর মহিলাটি লুটিয়ে পড়লেন। একটু পরেই অজ্ঞান। আমি রুমাল বার

করে হাওয়া করতে লাগলুম। ট্যাক্সি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে আর ড্রাইভার আড় চোখে এক একবার পিছন দিকে চাইছে।

এমন ট্যাক্সির হাওয়া, আর আমার রুমালের বাতাস; কিন্তু তাতেও জ্ঞান হ'তে চায় না, এদিকে দেখি ব্লাউজ ভিজে উঠেছে। বাড়ী পৌঁছুতেই বাড়ীর লোকজন সব ছুটে এলেন। তখন একটু একটু জ্ঞান ফিরে এসেছে।

তারপর...

সকলের আহ্বান উপেক্ষা করে এক লাফে বেরিয়ে পড়লুম ঘর থেকে। ষ্টলে ফিরে দেখি সব ফাঁকা! মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লুম—উঃ, এর জন্যেই কি ভগবান এতদিন এই ভূতের বোঝা আমাকে বওয়ালেন! মাতৃআজ্ঞায় মাতা, পিতা, পুত্র আজ সব সর্ব্বস্বান্ত! লেডির জন্যে তৈরী দোকান লেডির জন্যেই শেষ।

হিটলারের পতন

বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্ত্তি হওয়ার ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। কোথাও বা ছেলের দল, কোথাও বা মেয়ের দল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নানা জল্পনা কল্পনা করিতেছে। কেহ টেবিলে রাখিয়া ফর্ম্ম ফিল্ আপ্ করিতেছে, কেহ বা আবার স্থানাভাবে ধরণীর বুকে আশ্রয় লইয়াছে, কাহাকেও বা আবার কলমাভাবে ফাউণ্টেন পেন যাঞ্চা করিয়া বেড়াইতে দেখা যাইতেছে। এম্নি আবহাওয়ার মধ্যে করুণাময় একদিন পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের খাতায় নাম লিখাইয়া বসিল! ইকনমিক্স তাহার ভাল লাগিত তাই সে এইটাই বাছিয়া লইয়াছে। দুই চারি দিনের মধ্যেই সে বেশ কলেজে তাহার স্থান করিয়া লইল। দেখিতে দেখিতে ইকনমিক্ সোসাইটির নির্ব্বাচন পালা আসিয়া পড়িল। করুণাও তাহাতে মাতিয়া গেল। সমিতিতে সে যে এবার একটি গণ্যমান্য স্থান অধিকার করিবে তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। পর দিন হইতে এই সমিতির সেক্রেটারী নির্ব্বাচন লইয়া বেশ গোলযোগ চলিতেছে সকলের মত যে, এবার আর হিটলারকে কোনক্রমে সেক্রেটারী করা হইবে না। সকলে এ বিষয়ে প্রপাগেণ্ডা করিবার জন্য করুণাকে ধরিয়া বসিল। ব্যাপার শুনিয়া ত করুণা অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল, হিটলারটা কে?

একজন বন্ধু বিদ্রূপ করিয়া জবাব দিল, সে আর কেউ না স্ত্রীলোকের বেশধারী মহামানব পুরুষ হিটলার!

আর একজন তাহাকে থামাইয়া বলিল, আরে না মশায়, না। আমাদের হিটলার ইকনমিক্ সোসাইটির সেক্রেটারী। নাম—মিস্ তমসা রায়, সিকথ্ ইয়ার ষ্টুডেন্ট। তিনি ক্লাস লেকচারের নোট টুকতে যখন বাউজ থেকে পেনটা খোলেন তখন হিটলারের পদাতিক সৈন্যের কুচ-কাওয়াজ করবার সময় বুটের প্রথম সমবেত আওয়াজের মতই খট্ করে একটা শব্দ হয়ে সারা ক্লাসের ছেলেকে চমকিয়ে বিহ্বল করে দেয়। আর ক্ষণেকের তরে সকলের দৃষ্টি যেন সঙ্গে সঙ্গে চুম্বকের মত তার দিকে আকৃষ্ট হয়। সে যখন চলে তখন ঠিক মিলিটারীদের মত সোজা হয়েই চলে, একটুও বেঁকে না আর তার গাম্ভীর্যমাখা মুখটা থাকে আকাশের পানে তোলা। শাড়ীর, জুতার আর কথোপকথনের ও যে ভঙ্গী বা নূতনত্ব নেই তা নয়।—বুঝলেন করুণাবাবু?

করুণা সব শুনিতে শুনিতে কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু, তাতে তাকে সেক্রেটারী করতে তোমাদের কিসের অমত?

একজন জোর গলায় বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, একেবারে গলে গেলে? চোখে ত দেখনি এখনও, নূতন এসেছ, সে বড় কঠিন ঠাঁই। আমাদের অমত অনেক, স্পেশেলি তার পুরুষ বিদ্বেষ ভাব আমরা ডিস্লাইক করি।

যাহা হউক এই সমস্ত মতামত হিটলারের প্রপাগেণ্ডা এবং বক্তৃতার জোরে সব পণ্ড হইয়া গেল। সেবারেও সেইই সেক্রেটারীর পদের

গৌরবটা অর্জ্জন করিয়া অবজ্ঞার চাহনি চাহিয়া চাহিয়া কলেজময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। করুণাও একজন ঐ সোসাইটির মেম্বর পদে আসীন হইল। এই সোসাইটির বিশেষ একটি অধিবেশন হইবে। একটি দিন স্থির হইল। এই সব লইয়া করুণার সহিত মিস্ তমসার আলাপ হইল। তমসার কাছে করুণা প্রস্তাব করিল যে, সে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবে। তাহাকে যেন প্রথম সুযোগ দেওয়া হয়।

করুণার কথায় মিস্ তমসার গাম্ভীর্য্য বেশ একটু বাড়িয়া গেল। সে মুখটা আরও একটু গম্ভীর করিয়া বলিল, আগে ফিমেল কেন্‌ডিডেটদের যদি কিছু বলবার থাকে তবে তাদের ত প্রথমে সুযোগ দিতে হ'বে ?

প্রথম আলাপেই এই ! করুণাময় মিস্ তমসাকে এইবার ঠিকভাবে উপলব্ধি করিল। দুঃখে রাগে অভিমানে সে কোন কথা না বলিয়া ফিরিয়া আসিল। ক্লাসের কাহাকেও এ অবজ্ঞার কথা জানাইল না। সমিতির বিশেষ অধিবেশন হইয়া গেল। কত মেয়ে তাহাদের রচনা পড়িল, বক্তৃতা করিল। দুই একজন ছেলেও সুযোগ পাইল কিন্তু তাহার আর সুযোগ মিলিল না। দুঃখে সেদিন সে প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিয়াছিল।

এম্নি হিটলারের কাছেও ছেলেদের আনা গোনার বিরাম নাই দেখিয়া করুণা অবাক হইয়া যায়। সেদিন একটি ছেলেকে হিটলারের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কথা বলিতে দেখিয়া করুণা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না সে একজন সহপাঠীকে বলিয়া ফেলিল—এই ছেলেগুলো আচ্ছা নিলর্জ্জ ত! ঐ একটা দাম্ভিক মেয়ের সঙ্গে সেধে সেধে কথা।

বলতে ওদের এত ভাল লাগে? একটু লজ্জাও হয় না!—হিয়ার ইউ আর—বলিয়া বন্ধু চিৎকার করিয়া উঠিল। ক্লাসের আর সকলে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ব্যাপার কি জানিবার জন্য ঘিরিয়া ধরিল; সে সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, এইবার আমাদের করুণাবাবু পথে এসেছেন।

একজন করুণাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, এর মধ্যেই কোন দিন কিছুর পরীক্ষা হয়ে গেছে বুঝি? তাই এই পরিবর্ত্তন? আরে জানেন না কেন অত ভিড় হয় ওর কাছে? ও যতই যাই হ'ক ভগবানের সৃষ্ট নারী! তার জন্যই ওর কাছে ভিড় হয় এত, যদি কোন দিন অতর্কিতে মিলে যায় সেই দুর্লভ রতন। এটাও বুঝতে পারেন না? ও আওয়ার হিটলার মিস্ তমসা রায়!—বলিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল!

পাশেই লেডিজ ওয়েটিং রুম।

হয়ত নামটা মিস্ তমসার কানে গিয়াছিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে সেখানে আসিয়া হাজির। করুণাকেই সে ধরিয়া বসিল, আপনি আমায় ডাকছিলেন?

করুণা ত হতভম্ব। এ আবার কি? সে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। কথার কোন উত্তর তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। তাহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া মিস্ তমসা রাগিয়া বলিলেন, বি জেণ্টেম্যান প্লিজ। না, আপনার দোষ এক্সকিউজ করা যায় না। চলুন আপনাকে সেক্রেটারীর কাছে যেতে হবে।

সব ছাত্র তখন তাহাকে হিটলারের প্রবল পরাক্রান্ত হাতে ফেলিয়া পালাইয়াছে। করুণা তখন কাঁদ কাঁদ হইয়া গিয়াছে। চোখ তাহার

যেন অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সে ধরা গলায় বলিয়া ফেলিল, আমি ত আপনার নাম করিনি!

ব্যাপার গুরুতর হয় দেখিয়া এইবার আর সব ছাত্র সাহস করিয়া আগাইয়া আসিল। তাহারা মিস্ তমসাকে বুঝাইয়া বলিল যে সত্যই সে নির্দোষী। তাহাকে এই রকম ভাবে অপমান করা উচিত নয়। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, নির্দোষীকে দোষী করিয়া আর কি হইবে? এবারের মত এক্সকিউজ করুন।—মেয়ে মানুষের নিকট সমবেত পুরুষের ক্ষমা ভিক্ষা! ইহাপেক্ষা হিটলারের আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? ক্ষমাই মঞ্জুর হইল।

এমি করিয়া ছয় মাস কাটিয়া গেল হঠাৎ হিটলার যেন করুণাকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেও তাহার সহিত দুই চারিটি কথা বলিবার সাহস করে। কি একটা বড় ছুটি আসিয়া পড়িল। এক্সকারশন্‌এ যাইবার তোড়জোড় চলিতে লাগিল। করুণা মেম্বার যোগাড় করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। একদিন সে লাইব্রেরী হল হইতে ছুটিয়া বাহির হইতেছে এমন সময় বাঁকের মুখে ধাক্কা হিটলারের সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল: আচ্ছা, অভদ্র ত আপনারা? একটুও খেয়াল করে রাস্তা চলতে পারেন না? একেবারে ফিমেল ষ্টুডেন্টদের ঘাড়ের উপর। অসভ্য নির্লজ্জ অসভ্য! দাঁড়ান এর জন্যে আমি আজই এখুনি সেক্রেটারীর কাছে কম্প্লেন করব।

এ আবার কি বিপদ! করুণা অপরাধীর মত করুণা প্রার্থনা করিয়া বলিল, দেখুন, আমি ত আর ইচ্ছে করে করিনি, বাইচান্‌স্ হয়ে গেছে।

—আপনি যে ইচ্ছে করে করেননি তা আমি কি করে জানব? পুরুষগুলো মেয়েদের দেখলে যেন কি ভাবে, একবারে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

—আচ্ছা, আমি আমার দুষ্কর্মের জন্যে ক্ষমা চাইছি!

পুরুষ ক্ষমা চাহিয়ছে—আর কি? হিটলারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। আর কিছুরই প্রয়োজন হইল না, সে ক্ষমা করিল।

আজ হইতে হিটলারকে রাগাইবার নেশা কেমন যেন করুণাকে পাইয়া বসিল। সে একদিন তাহাকে ঠাট্টা করিয়া গম্ভীর সুরে বলিল, আপনিও ত আমাদের পুরী এক্সকারশনে যাচ্ছেন?

হিটলার অবজ্ঞার সুরে বলিল, না। ওসব পুরুষদের পাশে যেতে আমি বড় অস্বস্তি বোধ করি।

—তা আপনি না যান আপনাদের ক্লাসের কয়েকটি ফিমেল ষ্টুডেন্টকে বলে দিন না? জানেন ত মেয়েরা না গেলে ছেলেরা যেতে চায় না।—

করুণা আরও গম্ভীর হইল।

—এঁ্যা, কি বল্লেন? মেয়েরা না গেলে ছেলেরা যেতে চায় না? এর মানে কি? মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গ ভালবাসে আর ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গ ভালবাসে এই ত আপনি বলতে চান? দ্বিতীয়টি সত্য হলেও, প্রথমটি একেবারেই সত্য না। আজকাল পুরুষগুলো যা হয়ে দাঁড়িয়েছে একেবারে ছদ্মবেশে সেভেজ, ব্রুট! আর তারাই বা যাবে কেন? কে পুরুষদের বিশ্রী আবহাওয়ার সঙ্গ লাভ করতে চায়?

দেখিতে দেখিতে এক্সকারশনের দিন আসিয়া পড়িল। সেদিন দেখা গেল, ফিমেল এবং মেল কেণ্ডিডেট কাহারও অভাব নাই। বিশেষ

আশ্চর্য্যের বিষয় মিস্ তমসার আগমন। ট্রেণে সারা রাত্রি হট্টোগোলের ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে পুরীর সমুদ্রে স্নান, ও প্রাতঃরাশ সারিয়া সকলে বেড়াইতে বাহির হইল। তাহার পর রাত্রে হোটেলে ফিরিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। মেয়েদের একটি ঘর আর তাহারই পাশে আলাদা ছেলেদের একটি. শুইবার ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং কাহারও ঘুমের কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই। খুব আনন্দের মধ্য দিয়া সমুদ্রের ঢেউ খাইয়া প্রথম সূর্য্যের রক্ত মাখা মুখ দেখিয়া বেশ কয়দিন পুরীতে কাটিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্ব দিন রাত্রে কাহার চিমটানীতে করুণার যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে রাগিয়া বলিল, এই অজয়! চালাকি করিস্‌নি আজ অনেক ঘুরেচি কাল আবার রাত জাগতে হবে!

সে একটু নড়িয়া চোখ মুজিল। একটু পরে সে আবার কাহার স্পর্শ অনুভব করিয়া চাহিয়া দেখিল। চক্ষু মেলিতেই তাহার মনে হইল সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। মিস্ তমসা কি করিয়া এত রাত্রে আসিল তাহাদের ঘরে। সত্যই ত মিস্ তমসা রায় তাহাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডাকিতেছে। সে উঠিয়া মন্ত্রচালিতের মত তাহার দিকে অগ্রসর হইল। পরে অবাক হইয়া বলিল, আপনি এখানে! কি দরকার?

মিস্ তমসা রায় চক্ষু সঙ্কেতে আস্তে আস্তে জানাইয়া দিল, চুপ করুন কিছু না, আমার সঙ্গে আসুন।

দুই জনে হোটেল হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িল। তাহার পর সোজা সমুদ্রের দিকের পথ ধরিয়া চলিল। সারা পৃথিবী তখন চাঁদের আলোয় জল্ জল্ করিতেছে; যেন লজ্জাবনতা কোন যুবতী সাদা অব-

গুণ্ঠনের মধ্যে নিজের সজীব দেহ লুকাইয়া রাখিয়াছে। সমুদ্র তরঙ্গের মালা সৈকত ময় বেলাভূমে আছাড় খাইয়া মরিতেছে। মিস্ তমসা সমুদ্রের তীরে আসিয়া বসিল। করুণাকে তাহার কাছে বসিতে বলিল। তাহার পর সে ভাবাবিষ্টের মত বলিয়া চলিল, আচ্ছা করুণা বাবু, আপনার এই পুরী, এই চাঁদনীর রাতে সমুদ্র তটের বালুকণার মন ভোলান রূপ, এই সমুদ্র তরঙ্গের লীলা খেলা, এইরূপ দু'জনে পাশাপাশি বসে গল্প করা, এসব আপনার কেমন লাগে বলুন ত?

করুণা কোন কথার উত্তর দিতে পারে না, সে মন্ত্রাবিষ্টের মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

মিস্ তমসা আবার বলে, বড় মোহিত, মুগ্ধ হয়ে গেছেন না করুণা বাবু? তা ত হ'বারই কথা। এই সবই আজ আমায় টেনে এনেছে এখানে এই মৃত্যুর পথে!—সে আরওএকটু করুণার গা ঘেঁসিয়া বসে। তাহার পর করুণার হাঁটুর উপর তাহার হাত ও চিবুক রাখিয়া নির্ব্বাক হইয়া সমুদ্র পানে চাহিয়া বসিয়া থাকে।

চাঁদ তখন পশ্চিম গগণে হেলিয়া পড়িয়াছে। দুই একটি লোকের রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইবার পদ শব্দ যেন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। বাতাসের বেগ অনেকটা থামিয়া আসিয়াছে। দিকচক্র বালে সমুদ্রের ঘন অন্ধকার সরিয়া গিয়া একটু একটু করিয়া সাদা হইয়া আসিতেছে হঠাৎ করুণার চমক ভাঙ্গে। সে বলে, ভোর হয়ে এল, ওরা যে সব উঠে পড়বে; চলুন আমাদের এখুনি ফিরতে হ'বে!

—উঠুক, ওরা উঠুক। আমরা ফিরব না। বড় ভাল লাগছে এই সমুদ্র তীর আর আপনার সঙ্গ! এমন সুখ জীবনে আমি আর কখনও

এক মুহূর্ত্তের জন্যেও পাইনি। দেখুন, দেখুন ঐ বড় ঢেউটার উপর ছোট ঢেউটা কেমন করে লুটিয়ে পড়ে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিলে—বলেই সে একেবারে করুণার বুকে লুটাইয়া পড়ে।

হঠাৎ পিছনে কয়জন ছেলের কলহাস্যে তাহাদের সম্বিত ফিরিয়া আসে। করুণা ধড় মড় করিয়া উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মিস্ তমসা তাহাকে উঠিতে দিল না। সে সেইরূপ করুণার বুকে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। করুণাও লাজ লজ্জার মাথা খাইয়া হিটলারের কবলে আত্মসমর্পণ করিল।

আর ইহারই কয়দিন বাদে দেখা গেল—লেকের ধারে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর ফ্ল্যাটে কাহাদের ফুলশয্যায় ধুম লাগিয়া গিয়াছে। একটি শিক্ষিত যুবক একটি হাসিমাখা, যুবতীকে বলিতেছে—একি করলে তমসা? পুরুষের সান্নিধ্যে তুমি সুখী হ'তে পারবে? একদিন কি বলেছিলে মনে আছে? বলেছিলে—পুরুষের গায়ে তোমাদের গা ঠেকলে—

মহিলাটী বাধা দিয়া তাহার চক্ষে অপরাধীর চাহনি হানিয়া যুবককে বলিতেছে, মিথ্যা, জান? এত দিন আমি অভিনয় ছাড়া আর কিছুই করিনি। মনে মনে আমার যে কি হ'ত তা তোমরা কি বুঝবে? সে দিন লাইব্রেরীতে তোমার স্পর্শ ই আমায় পাগল করে তুলেছিল। তাই না আমার পুরী যাত্রা? পুরুষের সান্নিধ্য কোন্ মেয়ে না চায়? তারা যতই শিক্ষিতা, দাম্ভিকা আর পুরুষ বিদ্বেষীই হক না কেন তাদের একটা সময় আসে যখন তারা মাতৃত্বের সাড়া পায় তখন তারা পুরুষকে কিছুতেই অবহেলা করতে পারে না; তাদের সঙ্গ-সুখ লাভ করবার জন্য পাগল হয়ে ছুটে বেড়ায়। আমারও ঠিক তাই হয়েছে। সেই সেদিন

তোমার স্পর্শে আমার ভেতরের সুপ্ত আদিম নারী অস্থির হয়ে উঠল নারীত্ব ছাড়া কি নারী হয়? কলেজে আমায় নাকি অনেকে হিটলার বলত; আমি শুনতুম আর মনে মনে হাসতুম। তোমার নাম জেনে অবধি মনটা আমার কেমন যেন তোমার উপর আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল তাই ছলে বলে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে সুখ পেতুম। তোমাকে পাওয়ার জন্যে পুরীতে সেদিন সেই সমুদ্র তীরে কি কঠিন কাজই না করছি বলত? এ রকম না করলে হয়ত তোমাকে পেতুম না।—যুবতী একেবারে যুবকের বক্ষে লুটাইয়া পড়ে।

সত্যই তমস। তুমি চিরকালই তমসাচ্ছন্ন ছিলে তাই তোমাকে কেউ সঠিক চিনতে পারেনি; বলিয়া করুণাময় তমসাকে বুকে টানিল। পুরুষের প্রকৃত স্নেহ পাইয়া তমসাও সম্পূর্ণরূপে নিজেকে করুণাময়ের কাছে বিলাইয়া দিল।

এমনি করিয়াই হিটলারের পতন ঘটিল।

সমাপ্ত